লিমন

একটি রেমাশ নিবেদন

ধাঁধায় ধাঁধায় গল্প

মুনির হাসান

শিবলু

একটি রেমাশ নিবেদন

বাংলাপিডিএফ

বইঘর

বইলাভার্স

কাজিরহাট

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

https://www.facebook.com/limon1999

ধাঁধায়
ধাঁধায়
গল্প

ধাঁধায় ধাঁধায় গল্প

মুনির হাসান

প্রতীক

©
সামিয়া আখ্‌তার

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

অলংকরণ : মোজাফফর হোসেন

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৬০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 446 -059 - X

DHANDHAI DHANDHAI GALPO (A Collection of Puzzles) by Munir Hasan
Published by PROTIK. 46/2 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
First Edition February 2001. Price : Taka 60.00 Only

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

উ ৎ স র্গ

ফারদীম রুবাই বুমবুমকে
—বাবা

ভূমিকা

ছোটবেলা থেকে গণিত আর যুক্তির প্রতি আমার একটু বেশি ভালবাসা ছিল। মাথা ঘামানোর আর অঙ্ক কষার সুযোগ পেলেই চেষ্টা করতাম। কখনো সফল হতাম, কখনো পারতাম না। তখন বড়দের সাহায্য নিতাম। মাথা ঘামানোর তেমন একটা সুযোগ অবশ্য পাওয়া যেত না। কারণ ধাঁধা নিয়ে আমাদের দেশে তেমন একটা লেখালেখি হয় নি। বাজারে বলতে গেলে তেমন কোনো বই-ই পাওয়া যেত না। বিদেশী পত্রিকায় স্যাম লয়েড, আর্নেস্ট ড্যুডনি কিংবা রেমন্ড স্ম্যালিয়নের নাম জেনে বইপাড়াতে ঘুরে বেড়াতাম পাজল-বুকের জন্য। কেন জানি না, আমাদের প্রকাশক-বিক্রেতাদের এই লাইনে তেমন আগ্রহ দেখি নি।

কাজেই, সবেধন নীলমণি বলতে ভারতীয় আনন্দবাজার গ্রুপের আনন্দমেলা। আনন্দমেলার প্রতি সংখ্যাতে ধাঁধার জন্য আলাদা অংশ থাকত। হাতে পেলে ঐ পাতাতে চলে যেতাম চট করে।

ধাঁধার সমাধান করতে গিয়ে নিজেই কখনো কখনো নতুন ধাঁধা ভাবতাম, ভাবতাম তার সমাধানের পথও। আরো পরে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসার পর, বুঝলাম ঐ কৌশলগুলোর অনেকগুলোই গণিত ও যুক্তিনির্ভর। কিছু গাণিতিক উৎকর্ষ থাকলেই গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা যায় সহজে।

এরপর থেকে গণিত ও যুক্তির ধাঁধা দেখলেই সমাধানে আগ্রহী হতাম, চেষ্টা করতাম। ইয়া পেরেলম্যানের অঙ্কের মজা বই থেকে অনেক কৌশল শিখলাম। অবশ্য, এখন বুঝি, অন্য অনেক গণিতের বইতেও এই কৌশলগুলো পাওয়া যাবে।

ধাঁধার বিষয়ে আমার আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে ১৯৯৪ সালে *ভোরের কাগজ* পত্রিকার *ইষ্টিকুটুম* পাতার সম্পাদক ছোটদের জন্য ধাঁধা লেখার প্রস্তাব দেন। সেই থেকে ভোরের কাগজ এবং পরে প্রথম আলো ও জনকণ্ঠে ধাঁধা নিয়ে আমি লিখতে শুরু করি।

ধাঁধাগুলো নিয়ে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশে দেশের কোনো প্রকাশক রাজি হবেন এটি আমি কখনোই ভাবি নি, যদি না প্রতীক প্রকাশনার আলমগীর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় হত। বলতে গেলে তাঁর উৎসাহেই আমার *গল্পে গল্পে ধাঁধা* প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁরই উৎসাহে দ্বিতীয় ধাঁধা সংকলন *ধাঁধায় ধাঁধায় গল্প* প্রকাশিত হচ্ছে।

ধাঁধায় ধাঁধায় গল্প সংকলনে যত ধাঁধা-কৌশল রয়েছে তার অনেকগুলোই প্রচলিত ধাঁধা। এগুলো বিশ্বের প্রায় অনেক দেশেই নানা আদলে প্রচলিত। কোনো কোনোটি গণিতনির্ভর—গণিতের বইয়ে খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। কোনো কোনোটি একেবারেই মৌলিক। সব ক'টি উপস্থাপিত হয়েছে আমাদের দেশের আবহে। তবে সবগুলোরই রয়েছে সাধারণ বৈশিষ্ট্য—কোনো না কোনো প্রশ্নের জবাব খোঁজা।

মাথা খেলানোর জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে গাণিতিক যুক্তি ও কৌশল যারা চর্চা করতে চায়, তাদের উপকারে যাতে আসে, সেভাবে ধাঁধাগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। কখনো

কৌশলটা সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে, কখনো তা দেওয়া হয়েছে বইয়ের শেষে, আলাদাভাবে। ইচ্ছে যে, পাঠক প্রথমে নিজেই সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে, না পারলে কৌশলটা পরে জেনে নেবে।

এই সংকলনের অধিকাংশ লেখা প্রকাশিত হয়েছে *ভোরের কাগজ*, *প্রথম আলো* ও *জনকণ্ঠ* পত্রিকায়। কিছু লেখা সংকলনকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য লেখা হয়েছে।

নতুন প্রজন্মকে যুক্তি ও গাণিতিক শৃঙ্খলার একটি বিশেষ ধারা ধরিয়ে দিতে পারলে আমার নিজের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ **মুনির হাসান**

কম্পিউটার সেন্টার
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রিয় নামে বয়স জান ১১
লাল সবুজের পালা ১৪
বুমবুমের বুদ্ধি চমৎকার, এক লাঠিতে নদী পার ১৭
টাকাগুলো গেল কই? ২০
রসগোল্লা, নয় শুধু গোল্লা ২৩
তাক ধিনা ধিন ধিনাক ধিন, জন্ম সাল-মাস জেনে নিন ২৬
বুমবুমে রাখ আস্থা, বিপদেও পাবে রাস্তা ২৮
ছুটির দিনে মামার বাড়ি ৩১
জন্মদিনের স্বপ্ন ৩৪
ইঁদুর মারতে আমায় কহ যে, ইঁদুর যায় না মারা সহজে ৩৭
সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর ৪০
গুণভাগের রকমফের ৪৩
বুমবুম দি ম্যাজিশিয়ান ৪৬
শিকল পরা ছল মোদের ৪৯
উপসর্গে জুড়লে তীর দেখা পাবে মহর্ষির ৫২
ম্যাজিক স্কোয়ারের কৌশল ৫৪
আমার মানুষেরা গান করে ৫৭
ভাগাভাগির দাবা খেলা ৫৯
তোমার আমার মতন ছিল মায়ের সাতটি ছেলে ৬২
মুক্তির মন্দির সোপান তলে ৬৫
ধাঁধার দেশে বুমবুম ৬৭

প্রিয় নামে বয়স জান

অনেকদিন পরে বুমবুমের সঙ্গে আমার মোলাকাত আমার জন্য খুব সুখের হল না। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও বলল, 'আচ্ছা বল তো খালা, একটা চারতলা বাড়ির দোতলায় উঠতে যদি দুটো সিঁড়ি লাগে, ওই বাড়ির তিনতলায় উঠতে কয়টা সিঁড়ি লাগবে?'

বরাবর যা করি। ওর বলা শেষ হওয়ার আগেই বলে ফেললাম, 'কেন? তিনটে।' ওমা, দেখি ওর মা-বাবাসহ সবই একসঙ্গে হাসছে! বুমবুমের মা, অর্থাৎ আমার বড়বোন মনে করিয়ে দিল, 'তা হলে আমাদের বাসায় আসার চার নম্বর সিঁড়িটা তুই কেমন করে পার হলি?' তাই তো। বুমবুমদের বাসাটা তিনতলায়। আর এখানে আসতে আমার চারটে সিঁড়িই পার হতে হয়েছে। এভাবে নাকাল করে, তারপর আমার ভাগনে বুমবুম আমার কাছে জানতে চাইল আমি কেমন আছি, নানাবাড়ির খবর কী। বটে!!

ঢাকায় বদলি হওয়ার পর কোথায় থাকব এ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার ব্যাংক থেকে অবশ্য বেশ কয়েকটি হোস্টেলের ঠিকানা বাতলে দিয়েছে। ইচ্ছে ছিল সেগুলোর কোনো একটাতে উঠব। কিন্তু বদলির খবর দুলাভাই অর্থাৎ বুমবুমের বাবাকে জানানোর পর হোস্টেলের মতলব আর কাজে এল না। আপা-দুলাভাই দুজনই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে, 'ঢাকাতে বোনের বাসা থাকতে কোনো হোস্টেলে থাকা চলবে না।' সেই থেকে আমি বুমবুমদের বাসায়। সারা দিনই বাসাতে আমরা কেউ থাকি না। দুলাভাইয়ের কর্মক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়, আপা সরকারি চাকরিজীবী আর বুমবুমের স্কুল। আমার ব্যাংক তো আছেই।

তবে প্রতিদিনই সন্ধ্যার পরে আমাদের একটা আড্ডার মতো হয়ে যায়। কোনো কোনো দিন বুমবুমও সেই আলাপে থাকে, যদি স্কুলে তেমন কোনো পড়া না থাকে।

সেদিন এ রকম এক আসরে আমি বলছিলাম আমার এক অভিজ্ঞতার কথা। আমার অফিসে দুই মেয়ে এসেছে নতুন ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খোলার জন্য। এ্যাকাউন্ট খোলার নিয়মকানুন জেনে ফরম নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমার মনে একটা সন্দেহ হল। সত্যি, ওদের বয়স আঠার হয়েছে তো? সেটিই বলছিলাম।

'ওমা। এ আর কঠিন কী।' আমার কথা শুনে বুমবুম বলল, 'যে কারো বয়স জানা তো খুবই সহজ ব্যাপার।'

'কীভাবে?' আমি একটু অবাক হলাম।

'যেমন ধর, তোমার বয়স।' বুমবুম বলল, 'আমি এক্ষুনি বের করে দিচ্ছি।'

'বেশ তো।'

বুমবুম বলল—তোমার বয়সকে ১০ দিয়ে গুণ কর। আমাকে বোলো না।'

'করলাম।' অনেকদিন পর বেশ মজা পাচ্ছি। 'এবার তোমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষের নামটা মনে কর।'

'করলাম। তারপর কী করব?'—জানতে চাইলাম।

'তোমার প্রিয় মানুষের নামে যে কয়টি অক্ষর আছে সে সংখ্যাকে ৯ দিয়ে গুণ কর।'

বেশ প্যাঁচালো মনে হচ্ছে। মনে মনে হিসাবটা শেষ করলাম।

'তা গুণফলটা তোমাকে বলব।' আমি বললাম। 'না না'। বাধা দিল ও, 'এবার প্রথম গুণফল অর্থাৎ তোমার বয়সকে ১০ দিয়ে গুণ করে যা পেয়েছিলে সেটি থেকে শেষের গুণফলটা বিয়োগ দাও।'

মুখে মুখে হিসাব করতে গিয়ে একটু বিপদে পড়ে গেলাম। আমার অবস্থা দেখে দুলাভাই কাগজ-কলম এনে দিলেন। হিসাবটা শেষ করলাম।

'বেশ।' বুমবুম উত্তেজিত, 'এবার ফাইনাল বিয়োগফলটা আমাকে বল।'

'২৩৪।' কাগজ দেখে বললাম।

'তা হলে খালামণি। তোমার বয়স হল ২৭। তাই না!' আনন্দিত বুমবুম, 'আমি ঠিক বললাম না!'

সত্যিই তাই। আমার ভাগনেটার তো অনেক এলেম!

অবাক হয়ে বললাম, 'কেমন করে করলি। আমাকে শিখিয়ে দিবি।'

'শেখানো তো যায়। তবে এর জন্য আমার পুরস্কারও চাই।'

'তথাস্তু'। বললাম আমি।

বন্ধুরা বুমবুমের শেখানো নিয়মটা তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি।

বয়স বের করার জন্য আমি যা করেছি তা সংখ্যারই একটি খেলা। যে কোনো সংখ্যার ১০ গুণিতক থেকে ৯ গুণিতক যেকোনো সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফলেই প্রথম সংখ্যা লুকিয়ে থাকে। আমার বেলায় প্রথমে আমার বয়স ২৭-কে ১০ দিয়ে গুণ করায় ২৭০ পেয়েছিলাম। আমার প্রিয় মানুষ বুমবুম। তার নামে চারটি অক্ষর। কাজেই ৪-কে ৯ দিয়ে গুণ করে পেলাম ৩৬। ২৭০ থেকে ৩৬ বিয়োগ করায় বিয়োগফল হল ২৩৪। ২৩৪-এর এককের সংখ্যা ৪ কে বুমবুম যোগ করেছে বাকি দুই অঙ্কের সংখ্যা ২৩-এর সঙ্গে এবং এভাবেই সে আমার বয়স পেয়েছে (২৩+৪)=২৭। অর্থাৎ শেষে যে বিয়োগফল হবে, তার এককের সংখ্যাটি যোগ করতে হবে অবশিষ্ট সংখ্যার সঙ্গে। যেমন কারো শেষ বিয়োগফল যদি ২৭৩ হয় তবে বয়স হবে ৩০ (২৭+৩), ৮২ হলে বয়স হবে ১০ (৮+২),৫২ হলে হবে ৭ (৫+২) ইত্যাদি।

সংখ্যার এ খেলার একটা উদাহরণ দেখ।

১৫ × ১০ =১৫০-৯ × ১ = ১৪১ = ১৪ + ১ = ১৫

১৫ × ১০ =১৫০-৯ × ২ = ১৩২ = ১৩ + ২ = ১৫

১৫ × ১০ =১৫০-৯ × ৩ = ১২৩ = ১২ + ৩ =১৫

১৫ × ১০ =১৫০-৯ × ৪ = ১১৪ = ১১ + ৪ = ১৫

১৫ × ১০ =১৫০-৯ × ৫ = ১০৫ = ১০ + ৫ = ১৫

১৫ × ১০ =১৫০-৯ × ৬ = ৯৬ = ৯ + ৬ =১৫

১৫ × ১০ =১৫০-৯ × ৭ = ৮৭ = ৮ + ৭ = ১৫

১৫ × ১০ =১৫০-৯ × ৮ = ৭৮ = ৭ + ৮ = ১৫

১৫ × ১০ =১৫০-৯ × ৯ = ৬৯ = ৬ + ৯ =১৫

অদ্ভুত, তাই না!

বন্ধুরা, ভাবছি, অফিসে গিয়েই সহকর্মীদের বয়স বের করে চমকে দেব।

তোমরাও তাই করবে নাকি?

লাল সবুজের পালা

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেলাম বুমবুমের চিল-চিৎকার—'আমি লাল। আমি লাল। আমি লাল।' অবাকই হওয়ার কথা। সাধারণত এই সময়টাতে বুমবুম পড়ায় ব্যস্ত থাকে। কাজেই ঝটপট নিজের রুমে হাতের ব্যাগটা রেখে আপার রুমে গেলাম। আপা সেলাই মেশিনের

সামনে। আর বুমবুমের হাতে একটা জাতীয় পতাকা। লাল–সবুজের পতাকা হাতে বুমবুম ওর মায়ের চারদিকে গোল হয়ে দৌড়াচ্ছে আর লাল লাল বলে চিৎকার করছে।

আপার কাছে শোনা গেল বৃত্তান্ত। আজ দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে বুমবুম ঘোষণা করেছে ওর একটা জাতীয় পতাকা চাই। সামনে বিজয় দিবস। ওইদিন বাড়ির ছাদে ওড়াবে। আপা খুঁজেপেতে একটুকরা সবুজ আর একটুকরা লাল কাপড় যোগাড় করেছে, দুলাভাইকে ফোন করে জেনেছে পতাকার মাপ।

জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ৫ ঃ ৩। পতাকার মাঝের লাল ভরাট বৃত্তটি হবে পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট। পতাকার দৈর্ঘ্যের ডানদিকে সাড়ে পাঁচ ভাগ আর বাঁদিকে সাড়ে চার ভাগ রেখে একটা সরলরেখা টেনে প্রস্থের ঠিক মাঝামাঝি বরাবর আরেকটি রেখা টানলে দুটি রেখা পরস্পরকে যেখানে ছেদ করে, সেই বিন্দুটি হবে বৃত্তের কেন্দ্র। সেভাবেই পতাকা তৈরি হয়েছে। আর লাল ও সবুজ কাপড়ের কিছু বেঁচে গেছে। সেখান থেকে লাল টুকরোটা বুমবুম নিতে চায়। সে জন্যই এই চিল–চিৎকার।

এরই মধ্যে দুলাভাই বাসায় ফিরেছে। আমাদের তিন জনকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে জানতে চাইল কী ব্যাপার। সব শুনে বুমবুমকে বলল—দেখ, তোমার মা ওই কাপড় দিয়ে আমাদের জন্য কিছু করতে পারে কি না। এই ফাঁকে বরং আমরা একটু গল্প করি। মায়ের হাতে লাল কাপড়টা দিয়ে বুমবুম ওর বাবার কাছে বলল—'বাবা, আমাদের গাড়িতে কি জাতীয় পতাকা লাগানো যাবে না? তুমি কালকেই গাড়িতে একটা ফ্লাগস্ট্যান্ড লাগিয়ে ফেলো।'

ওর পতাকা–উৎসাহ দেখে আমার খুব মজা লাগছে। ওর বাবা তখন ওকে বুঝিয়ে বলছে বছরের সব দিন গাড়িতে জাতীয় পতাকা লাগাতে পারেন শুধু নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এরা হলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার ইত্যাদি। তবে, বছরে দুদিন যে কেউ গাড়িতে বা বাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়াতে পারে।

বুমবুমকে বললাম, 'তুই কি জানিস, কোন দুদিন?'

'মনে হয় জানি', বুমবুমটা একটু আঁতেল ধরনের। '২৬ মার্চ আর ১৬ ডিসেম্বর। তাই না বাবা?'

'হ্যাঁ, এই দুদিন। ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। আর ১৬ ডিসেম্বর?'

'বাঙালির বিজয় দিবস।' বুমবুম একটা চিৎকার দিয়ে উঠল—'এদিনে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। সাত জন বীরশ্রেষ্ঠর ছবি আছে আমাদের বইতে।'

'তাই নাকি?' আমি একটু অবাকই হলাম। কারণ আমাদের সময়ে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের কথা খুব বেশি লেখা ছিল না।

আপাও দেখলাম হাতে কয়েকটা লাল–সবুজ কী জানি নিয়ে আমাদের আসরে যোগ দিয়েছেন। বললেন, 'বুঝলি, এখনকার পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক কথাই লেখা হয়েছে।'

মায়ের কাছ থেকে বুমবুম ততক্ষণে লাল-সবুজ কাপড়ের টুকরোগুলো নিয়ে নিয়েছে। 'দেখ, মা কী বানিয়েছে। পাঁচটা টুপি। তিনটে সবুজ আর দুটো লাল। এগুলো দিয়ে কী হবে মা?'

'কী হবে।' আমি বললাম 'বিজয় দিবসের র‍্যালিতে আমরা বাসাসুদ্ধ সবাই ওই টুপি পরে যোগ দেব।'

'তা তো দেবই। তার আগে বরং একটা খেলা হয়ে যাক'—ঘোষণা করলেন বুমবুমের বাবা।

খেলা শুনেই বুমবুম খুশি।

দুলাভাইয়ের কথামতো আমি, আপা আর বুমবুম একজনের সামনে একজন এভাবে লাইনে দাঁড়ালাম। আমি যেহেতু লম্বা, কাজেই সবার পেছনে। আমার সামনে আপা, মানে বুমবুমের মা আর সবার সামনে বুমবুম।

দুলাভাই বললেন, 'আমার কাছে তিনটি সবুজ আর দুটি লাল টুপি। তোমরা এবার চোখ বন্ধ কর। আমি তোমাদের মাথায় তিনটি টুপি পরিয়ে দিচ্ছি।' কথামতো আমরা চোখ বন্ধ করলাম।

'ব্যস, এবার চোখ খোল'—বললেন দুলাভাই। 'বাকি দুটো টুপি আমি সরিয়ে ফেলেছি।' এই বলে দুলাভাই আমার সামনে আসলেন।

'বল তো ব্যাংকার, তোমার মাথার টুপির রং কী।'

'একি মুশকিল। আপা ও বুমবুমের টুপি দুটো আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু নিজেরটা। ঘরে কোনো আয়নাও নেই। আমতা আমতা করে বললাম 'না, মানে ইয়ে—কেমনে বলব?'

'পারলে না তো? এবার বুমবুমের মা তুমিই বল তোমার মাথার টুপির রং।'

দুর। আমি তো তাও দুটো টুপি দেখেছি। আপা তো দেখছে মাত্র বুমবুমেরটা। তা হলে কী আর পারবে। বুমবুমের মাও পারল না।

'এবার আমাদের একুশ শতকের মুক্তিযোদ্ধা বীর বুমবুম। তুমিই বল তোমার মাথার টুপির রং কী?'

সবাইকে অবাক করে বুমবুম ঠিক ঠিক নিজের মাথায় টুপির রং বলে ফেলল! আমি বুঝলাম ওই ছোট্ট যোদ্ধাটির মাথা কত পরিষ্কার।

বন্ধুরা কী বলতে পার বুমবুমের মাথায় কোন রঙের টুপি ছিল আর বুমবুমই বা সেটা কীভাবে জানল?

বুমবুমের বুদ্ধি চমৎকার, এক লাঠিতে নদী পার

এই যা! দূর থেকেই দেখলাম ঘাটের নৌকাটা তীর ছেড়ে সরে গেল। বুমবুম অনেক চিৎকার-চেঁচামেচি করেও থামাতে পারল না। হতাশ হয়ে একেবারে মাটির ওপরেই ও বসে পড়ল।

আমরা মানে আমি, বুববুম আর ওর বাবা রূপগঞ্জ থানার একটি গ্রামে এসেছি সকালে। আমাদের সঙ্গে একজন গাইড মতনও আছেন। আজিজ সাহেব। রূপগঞ্জের এই এলাকাতেই হবে রাজউকের উপশহর পূর্বাঞ্চল। এখানে বড় আপার একটা জমি ছিল, যা রাজউক অধিগ্রহণ করেছে। ক্ষতিপূরণের জন্য যে জরিপ হচ্ছে, সেটি যেন ঠিকমতো হয় সেজন্য আমাদের এখানে আসা। দুলাভাই একা আসতে চেয়েছিলেন। বুমবুম আর আমি তার 'লেজে' ধরেছি।

আজিজ সাহেব বললেন, ঘাটের নৌকা আবার ফিরতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে। আমাদের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় আমরা ফিরছিলাম তাড়াতাড়ি। ঢাকা ফিরতে এরকম আরো দুটো নদী/খাল আমাদের পেরোতে হবে।

যাক্‌গে! চিন্তা করলে তো আর নৌকা আসবে না। আমি তাই একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়লাম। দুলাভাই এদিক-সেদিক দেখে বুমবুমকে ডাকলেন। 'আমার এখন খুব শিকদার বাবুকে মনে পড়ছে। তাকে দিয়ে আমাদের সময় কাটানো যায় না?'

আমি ভাবলাম কোন শিকদার! এরশাদ শিকদার না তো। বুমবুমের তো তার সম্পর্কে বিশদ জানার কথা নয়। 'তা ঠিক বলেছ, বাবা।' বুমবুম বলল, 'এই নদীটাতে আমরা শিকদার বাবুকে কাজে লাগাতে পারি।'

কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। নদী, আবার শিকদার! আমার অবস্থা দেখে দুলাভাই হাসলেন—'তুমি যে এরশাদ শিকদারের কথা ভাবছ তা আমি জানি। তবে বলা হচ্ছে রাধানাথ শিকদারের কথা।'

রাধানাথ শিকদার! এ আবার কে?

'ওমা, খালা। তুমি রাধানাথ শিকদারের নাম শোন নি। রাধানাথ শিকদার, প্রথম কাগজে-কলমে এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা সঠিকভাবে নির্ণয় করেছিলেন'—বুমবুম বলল।

বুঝলাম। বাপ-বেটার এক পেট। বললাম—'আশপাশে তো কোনো পাহাড় নেই। শিকদার বাবু আমাদের কী উপকার করবেন?'

'কুছ পরোয়া নেই', বুমবুমের বাবা বলল। 'বুমবুম বরং এই নদীর প্রস্থ বা চওড়াটা বের করে ফেলুক।'

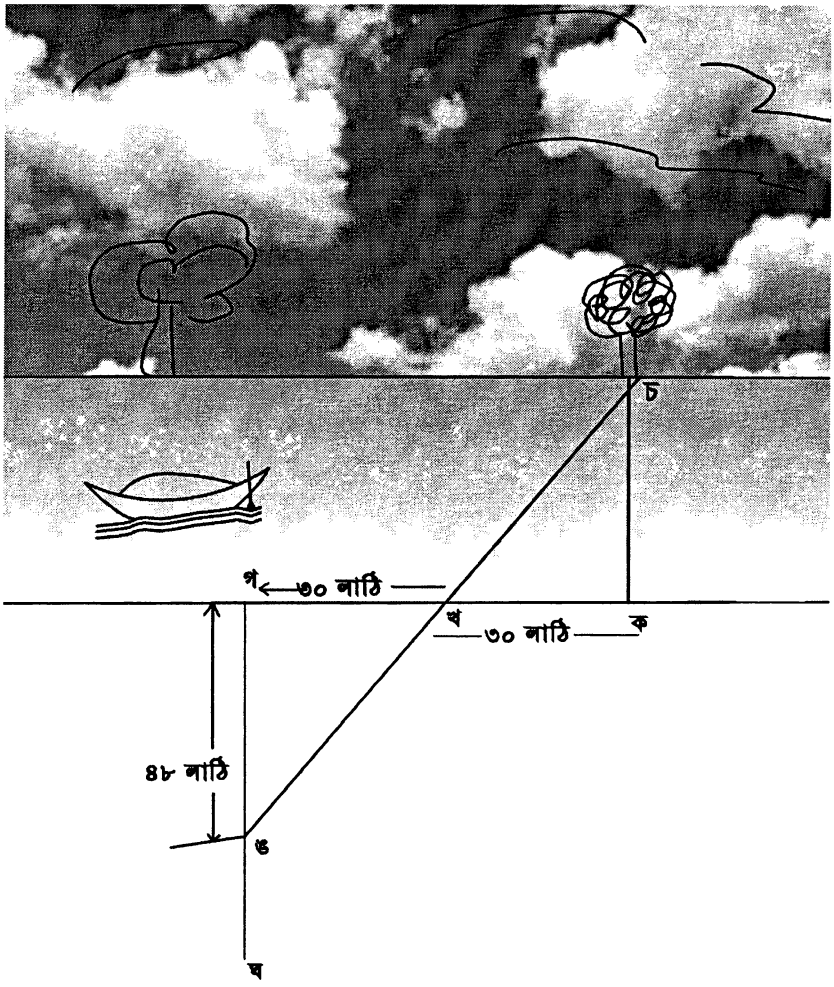

বাপ-বেটা মনে হয় আমাকে বোকা বানানোর পাঁয়তারা করছে। দেখি দুজনে কী করে? এদিক-সেদিক থেকে বুমবুম একটা লাঠির মতো যোগাড় করল। 'এই হল আমার মাপার একক' ঘোষণা করল সে। (মাথামুণ্ড কিছুই বুঝলাম না।) তারপর, আমাকে নিয়ে যা যা করল তা তোমাদের জন্য সংক্ষেপে গুছিয়ে লিখছি।

ছবিতে দেখ আমরা নদীর যে পাড়ে তার অপর পাড়ে একটা কড়ইগাছ (ছবিতে 'চ' বিন্দুতে)। বুমবুম আমাকে নিয়ে গাছ বরাবর এপারে একটা দাগ দিল (ছবিতে 'ক')। তারপর নদীর পাড় বরাবর হাতের লাঠি দিয়ে মোট ৩০ লাঠি দূরত্বে (ছবিতে 'খ' অবস্থান) একটি কাঠি পুঁতল মাটিতে।

এরপর আবার ৩০ লাঠি দূরত্বে আর একটা কাঠি পুঁতল ('গ' চিহ্নিত স্থানে)। এরপর আমাকে নিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল গাছের উলটোদিকে (ছবিতে 'গ ঘ' রেখা বরাবর)। তারপর এক সময় দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখ তো, আমার লাঠি, 'খ' বিন্দুর লাঠি আর ওই পাড়ের গাছ একই রেখায় আছে কি না।' আমরা কয়েকবার এদিক-সেদিক করে শেষ পর্যন্ত 'ঙ' বিন্দুতে বুমবুমের হাতের লাঠি বসানোতে ওই লাঠি, 'খ' বিন্দুর লাঠি ও গাছ একই রেখায় এল!

'ব্যস, আমার কাজ শেষ।' ঘোষণা করে বুমবুম তার মাপার লাঠি দিয়ে 'গঙ' দূরত্বটা মেপে বলল—'এই নদীটা ৪৮ 'লাঠি' চওড়া। আর বাসায় গিয়ে লাঠিটা কত লম্বা তা স্কেল দিয়ে মেপে নিলে মিটার বা গজে দূরত্বটা আমরা পেয়ে যাব। তাই না বাবা?' বুমবুমের বাবা এতক্ষণ তার ছেলের কাণ্ড দেখছিল। এবার সায় দিল, 'খুবই ঠিক হয়েছে। বুমবুম, ইয়্যু আর রিয়েলি গুডবয়।'

বুমবুমের লাঠি আর মাপামাপি তো আমি কিছুই বুঝি নি। বন্ধুরা তোমরা বলতে পার কীভাবে বুমবুমের মাপটা ঠিক হল?

টাকাগুলো গেল কই?

আমি নতুন শাখায় বদলি হয়েছি। এখনকার অফিস আর বুমবুমের স্কুল পাশাপাশি। বিকেলে এখন দুজনই একসঙ্গে ফিরি। বুমবুম মাঝেমধ্যে ফাঁক পেলে আমার অফিসে আসে।

কদিন আগের কথা। দুপুর নাগাদ আমাদের ব্যাংকে বেশ হইচই পড়ে গেল। কী হয়েছে? না—এক গ্রাহক এসে বললেন, ব্যাংক তার হিসাবে বেশ গরমিল করেছে। তিনি ব্যাংকের কাছে টাকা পান। ম্যানেজারের রুমে বেশ ঝামেলা। ভদ্রলোক বললেন, তিনি ব্যাংকে ১ লাখ টাকা জমা রেখেছিলেন আর কয়েকবারে পুরো টাকাটা তুলে নিয়েছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, তার তোলা টাকা আর ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার হিসাব মিলছে না। তিনি তার হিসাবের বই দেখালেন।

ব্যাংক থেকে তোলা টাকা	ব্যাংকে অবশিষ্ট জমা
৫০,০০০	৫০,০০০
২৫,০০০	২৫,০০০
১০,০০০	১৫,০০০
৮,০০০	৭,০০০
৪,১০০	২,৯০০
২,৯০০	০০
মোট ১,০০,০০০	মোট ৯৯,৯০০

অর্থাৎ ভদ্রলোকের দাবি তিনি ব্যাংক থেকে আরো ১০০ টাকা পান।

ব্যাংকের অনেকেই ভদ্রলোকের দাবি মেনে নিতে চান আবার অনেকেই বলছেন, কোথাও কোনো গোলমাল হচ্ছে। টাকাটা দেওয়ার দরকার নেই। আমিও একবার হিসাবটা দেখে এসেছি। চেয়ারে ফিরে দেখি বুমবুম। কী হয়েছে?

ওর স্কুল আজ ছুটি হয়ে গেছে, তাই ও বাসায় চলে যাচ্ছে। এটা জানাতে আমার কাছে এসেছে। বুমবুমকে দেখে মাথায় একটা বুদ্ধি এল। দেখা যাক, ভাগ্নে পারে কি না? বুমবুমকে নিয়ে ম্যানেজারের রুমে গেলাম। সেখানে বেশ জটলা। ম্যানেজারকে বললাম, আমার ভাগ্নেটা বেশ চটপটে। ওকে মনে হয় আমাদের সমস্যাটা বলা যায়।

কী ভেবে ম্যানেজার রাজি হলেন। ভদ্রলোক তার বৃত্তান্ত এবং হিসাবটা বুমবুমকে বুঝিয়ে দিল।

হিসাবটার দিকে তাকিয়ে বুমবুম বলল, 'আমাকে একটা কাগজ-কলম দেবেন?'

'এই নাও।'

কাগজে কী সব লিখে বুমবুম গ্রাহক ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনি ব্যাংকের কাছে কোনো টাকা পান না।'

ভদ্রলোক বললেন, (মনে হয় রেগেই গেছেন, একটা ছোট্ট ছেলে কিনা বলছে তার হিসাব ভুল) 'তার মানে, তুমি বলতে চাও আমার হিসাব ভুল?'

'না?' বুমবুম হাসছে। 'আপনার হিসাবও ঠিক আছে।'

ভদ্রলোক রেগেমেগে ম্যানেজারের উদ্দেশে বললেন, 'এসবের অর্থ কী?' বেগতিক দেখে আমি তাড়াতাড়ি বুমবুমকে বললাম, 'উনি টাকাও পাবেন না, আবার ওনার হিসাবও ঠিক, দুটোই কীভাবে সম্ভব?'

'সম্ভব' ব্যাখ্যা করার বুমবুমের এই ভঙ্গিটা আমার চেনা। এটা আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ। 'দেখুন' আপনারা দুটো ভুল যোগফলের তুলনা করছেন। ব্যাংক থেকে তোলা টাকা আর ব্যাংকে অবশিষ্ট টাকা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এই দুটোর মধ্যে মিল খোঁজাটা বোকামি।'

একটু থেমে বুমবুম বলল, 'ধরুন, ভদ্রলোক যদি দুবারে তার টাকাটা তুলতেন তা হলে হিসাবটা কেমন হত। কাগজে লিখে বুমবুম হিসাবটা দেখাল।

ব্যাংক থেকে তোলা টাকা	ব্যাংকে অবশিষ্ট জমা
৫০,০০০	৫০,০০০
৫০,০০০	–
মোট =১,০০,০০০	মোট = ৫০,০০০

বুমবুম হিসাবটা কাগজে লেখা মাত্রই আমাদের সবার কাছে ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের বিভিন্ন দিনে টাকা ওঠানোর বিভিন্ন সংখ্যা দুটো যোগফলকে কাছাকাছি নিয়ে আসায় এই বিভ্রান্তি হয়েছে। অর্থাৎ, ব্যাংক থেকে তোলা টাকা আর ব্যাংকে অবশিষ্ট টাকার হিসাব দুটো আলাদা হিসাব মাত্র।

বুমবুমের প্রতিভাতে সবাই মুগ্ধ। আমিও একটা ডাঁট নিলাম।

দেখতে হবে না কার ভাগ্নে!

ম্যানেজার সাহেব জোর করে বুমবুমকে খাইয়ে দিলেন আর আমাকে সেদিনের মতো ছুটি দিয়ে বললেন, যান বুমবুমের জন্য আজ আপনার ছুটি। ওকে নিয়ে বাড়ি যান।

রসগোল্লা, নয় শুধু গোল্লা

বিদেশে থাকার সময়ই জেনেছি যে আমাদের আবাসস্থল বদলি হচ্ছে। আমি যে ব্যাংকে চাকরি করি, সেটি আবার একটি ব্যাংক কিনে নিয়েছে। দুটো ব্যাংক মিলে একটা হচ্ছে। এই ঝামেলার সময়ে আমাকে পাঠানো হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে, প্রশিক্ষণের জন্য। দেশে ফিরেই বুঝলাম 'পড়বি পড় মালির ঘাড়ে'। নতুন বাসায় একটি রুম কম। কাছেই আমাদের খালা-বোনপো'র একই রুম। আমাকে আর বুমবুমকে থাকতে হবে একসঙ্গে। বুমবুম ভীষণ দুষ্টু তবে মাথাটা বেশ খোলতাই, প্রায় আমাকে সে নাস্তানাবুদ করে।

এই তো সেদিন, অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি ভালো আয়োজন খাওয়াদাওয়ার। দুলাভাই কী কারণে যেন অনেক খাবারদাবার কিনে এনেছে, সঙ্গে বুমবুমের ফেবারিট স্পঞ্জের রসগোল্লা। গরম গরম খেতে কী যে মজা!

যা বলছিলাম। রসগোল্লা খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল। বুমবুমের মা বলল, 'রসগোল্লা দেখলেই আমার সৈয়দ মুজতবা আলীর কথা মনে পড়ে।'

আমি যোগ করলাম, 'ইতালিতে রসগোল্লা নিয়ে যাবার গল্পটা তো? আমিও পড়েছি।'

'তা! বাবা তোমার কিছু মনে পড়ে না।' একটা রসগোল্লা পুরোটা মুখে পুরতে পুরতে বুমবুম বলল তার বাবাকে।

'সে বড় দুঃখের স্মৃতি', দুলাভাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

'সে কী আমাকে বল নি তো!' আপাও বেশ অবাক।

আমরা চেপে ধরতেই দুলাভাই বলতে শুরু করলেন—"ভার্সিটিতে পড়ার সময় হলে আমার আরো দুজন রুমমেট ছিল।'

'জানি', বুমবুম বলল 'কালাম কাকা ও সেলিম কাকার কথা তুমি হরহামেশাই বল।'

'হ্যাঁ। তোর সেলিম কাকার বাড়ি কুমিল্লায়। সেলিমের কাকা প্রায়শই তাকে দেখতে আসত, সঙ্গে আনত কুমিল্লার রসমালাই অথবা জলযোগের রসগোল্লা।' একটু দম নিয়ে দুলাভাই বললেন—'তা একদিন সকাল ১১টার দিকে রুমে ফিরে দেখি—একটি রসগোল্লার হাঁড়ি, আর তার নিচে একটা চিঠি চাপা দেওয়া। সেলিমের কাকা এনেছে। চিঠিতে লিখেছে তিন জনে যেন ভাগ করে খায়।'

'এ তো ভালো কথা। দুঃখের স্মৃতি বলছ কেন' আপা দুলাভাইকে বলল।

'আগে সবটা শোনই না!' দুলাভাই বললেন—'তা, আমি সঙ্গে সঙ্গে তিন ভাগ করে এক ভাগ খেয়ে ফেললাম। বাকিগুলো হাঁড়িতে রেখে ক্লাসে চলে গেলাম।'

গল্প শোনার ফাঁকে কিন্তু আমরা রসগোল্লা খেয়েই যাচ্ছি।

'তা রাতে রুমে ফিরে দেখলাম হাঁড়িতে কয়েকটা তখনো আছে।' দুলাভাই বলে যাচ্ছেন—'সেলিম আর কালামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তারপর যা শুনলাম তা অতি মজার। আমি ক্লাসে চলে যাওয়ার পর কালাম রুমে আসে এবং রসগোল্লা আর চিঠিটা দেখে। তখন সে হাঁড়ির রসগোল্লা তিন ভাগ করে এক ভাগ খেয়ে চলে যায়। পরে, বিকালে সেলিম এসেও একই কাণ্ড করে, অর্থাৎ সেও হাঁড়িতে যে কয়টা রসগোল্লা পেয়েছিল সেগুলোকে তিন ভাগ করে এক ভাগ খেয়ে নেয়। বাকি দু ভাগ পড়ে থাকে হাঁড়িতে।'

'তার মানে। তোমরা তিন জনই যেহেতু আলাদা-আলাদাভাবে খেয়েছিলে, তাই প্রত্যেকে ভাবছিলে নিজের ভাগ খেয়ে নিয়েছ।' আপা একটা ব্যাখ্যা করল।

'ঠিক তাই।' দুলাভাই বললেন, 'তারপর আমরা হাঁড়ি থেকে রসগোল্লা বের করে দেখি আরো ৮টা তখনো সেখানে আছে।'

'আমি তখন বললাম, তা হলে আমরা কে কয়টা খেয়েছি হিসাব করে, এখন এই ৮টা সেভাবে ভাগ করে নিই, যাতে সবার ভাগ সমান হয়।'

আপা বলল—'৮টার মধ্যে ২টা তুমি খেয়েছিলে আর বাকিরা ৩টা করে, তাই না?'

'তা হলে কি আমার স্মৃতিটা দুঃখের হত।' বড় এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুলাভাই বললেন।

'তোমার দুঃখ আমি বুঝেছি, বাবা।' বুমবুম ওর বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। 'সবার ভাগ সমান করতে গিয়েই তো তোমার দুঃখ।'

'কীভাবে?' আমি আর আপা একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

বুমবুমের ব্যাখ্যা যখন শেষ হল তখন আমরা বুঝলাম দুলাভাই কেন দুঃখিত হয়েছিলেন। বন্ধুরা তোমরা বলতে পার ঐ হাঁড়িতে শুরুতে কয়টা রসগোল্লা ছিল আর শেষের ৮টার মধ্যে কে কতটা পেয়েছিল?

তাক ধিনা ধিন ধিনাক দিন, জন্ম সাল–মাস জেনে নিন

বুমবুমের কাছ থেকে কিছু ট্রিকস শিখে আমি ইদানীং আমার ব্যাংকে বেশ জনপ্রিয়। টুকটাক গুণ–ভাগ পারি। এমনকি নতুন কেউ এলে তার বয়সটা বের করে ফেলতে পারি।

অফিস থেকে আমরা পিকনিকে যাব। তাই ভাবলাম বুমবুমের কাছ থেকে নতুন কোনো টেকনিক শিখে যাই। পিকনিকে সবাইকে চমকে দেওয়া যাবে।

অনুরোধটা বুমবুমকে করতে ও সানন্দে সায় দিল। বলল—মনে মনে একটা সংখ্যা ধর তো, খালামণি?'

ধরলাম।

'এরপর ঐ সংখ্যার সঙ্গে ঐ সংখ্যা যোগ দাও।'

'দিলাম।'

'তা আমি তোমাকে দিলাম ২০।'

'২০ নিলাম।' [২০ যোগ করলাম]।

'এবার যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ দাও। দিয়েছ? এবার প্রথমে যে সংখ্যাটা ধরেছিলে সেটি ভাগফল থেকে বাদ দাও।'

'দিলাম।'

'তোমার কাছে এখন আছে ১০।' বুমবুম বলল।

কীভাবে করলি। বুমবুম ব্যাখ্যা করাতে বুঝলাম আসলে আমি একটা সংখ্যাকে প্রথমে ২ দিয়ে গুণ করেছি তারপর ২ দিয়ে ভাগ করেছি। তা হলে প্রথম সংখ্যাটিই থাকল। তারপর ঐ সংখ্যাটা বাদ দিয়েছি। তা হলে কিছুই থাকে না। এর ফাঁকে বুমবুম আমাকে দিয়ে ২০কে ২ দিয়ে ভাগ করিয়েছে। তাই, আমার কাছে শেষে ছিল ১০।

'এটা খুব সহজ হয়ে গেল রে? সবাই বুঝে ফেলবে।' আমি বললাম।

'বেশ। আর একটা শিখিয়ে দিচ্ছি।' বুমবুমের বেশ শিক্ষক শিক্ষক ভাব।

'তোমার জন্ম–সনটা নাও। শেষ দুই সাল নিলে চলবে। এরপর সেটাকে ২০ দিয়ে গুণ কর।' বুমবুম বলল।

'দাঁড়া। কাগজ–কলম নিই।' আমি বললাম। তারপর গুণ করলাম।

'এরপর এর সঙ্গে যোগ দাও ৬৯।' বুমবুম বলেই যাচ্ছে। 'যোগফলকে ৫ দিয়ে গুণ কর। করেছ?'

এত অস্থির হওয়ার কী হল। আমি কি ওর মতো অঙ্ক পারি নাকি!

'এবার এর সঙ্গে তোমার জন্ম মাসের সংখ্যাটা যোগ দাও।'

জন্ম মাসের সংখ্যা মানে জানুয়ারি হলে ১, ফেব্রুয়ারি হলে ২ এরকম।

'সব শেষ সংখ্যাটা আমাকে বল।' বুমবুম থেমেছে। কাগজ দেখে নিয়ে বললাম—৭৫৫৬।

একটু হিসেব করে নিয়ে বুমবুম বলল—'৭২ সালের নভেম্বর মাসে তোমার জন্ম। ঠিক বলেছি না?'

'তুই তো ঠিক বলবি। এখন আমাকে শিখিয়ে দে।'

বুমবুমের কাছ থেকে আমি টেকনিকটা শিখে নিয়েছি। বন্ধুরা, তোমরা প্রথমে নিজেরা কৌশলটা বের করার চেষ্টা কর, দেখবে এইভাবে ইচ্ছেমতো জন্ম মাস, তারিখ, বয়স সবই বের করা যায়। যারা পারলে না, তারা বইয়ের শেষে কৌশলটা দেখে নাও।

বুমবুমে রাখ আস্থা, বিপদেও পাবে রাস্তা

দ্বিতীয় বাঁকটা ঘুরেই আমরা বিপদে পড়ে গেলাম। একটি চৌরাস্তার মতো, চারদিকে চারটে রাস্তা চলে গেছে। কোথাও কোনো নিশানা দেখা যাচ্ছে না।

হাঁফ ছেড়ে বললাম—'তখনই বলেছিলাম, রাজি হওয়ার দরকার ছিল না।'

আমার কথা শুনে বুমবুম কিছুই বলল না। এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজছে। এই ফাঁকে বিপদের কথাটা ভেঙে বলি। অফিসে আমার সহকর্মীরা বুমবুমের কথা প্রায়ই শোনে আমার কাছে। সেজন্য আমাদের সঙ্গে বুমবুমও অফিসের পিকনিকে এসেছে।

আমরা এসেছি ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানে। জুঁই নামের একটি কটেজ আমাদের পিকনিক স্পট। সেখান থেকে লেকের নৌকা করে আমরা এসেছি চম্পা নামের রেস্ট হাউজের সামনে। বাকিরা আবার নৌকা করেই ফিরেছে। কিন্তু বুমবুমের ইচ্ছে হওয়ায় আমরা বনের মধ্যে হেঁটে জুঁইতে ফিরছিলাম। কিছুক্ষণ পথনির্দেশিকা থাকায় ঠিকমতো এগিয়েছি। এখন যত বিপত্তি।

'হুররে' বুমবুমের চিৎকার শুনে সংবিৎ ফিরল। দেখি কী একটু দূরে একটি পথনির্দেশক সাইনবোর্ড। কিন্তু ওটি ভেঙে মাটিতে পড়ে আছে। তা হলে?

'চল দেখা যাক।'

বুমবুমের কথামতো আমরা ওই ভাঙা সাইনবোর্ডের কাছে গেলাম। দেখলাম চম্পা, সালমা, জুঁই ও মণিহার—ওটার চারদিকে এই চারটি নাম লেখা। কিন্তু মাটিতে গেঁথে নেই। মাটিতে পড়ে আছে। তা হলে জুঁই কোনদিকে বুঝব কী করে?

'নো চিন্তা।'

বুমবুমটা কী ভাবছে! দেখি কী, ও সাইনবোর্ডটাকে ধরে রাস্তার মাথায় নিয়ে এল। তারপর আমরা যে রাস্তা দিয়ে এসেছি সেদিকে 'চম্পা' লেখাটা ঘুরিয়ে দিল।

'তাই তো।' এভাবেই তো রাস্তার অবস্থানটা পাওয়া যাচ্ছে। এবার জুঁই লেখাটার দিক অনুসরণ করে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই জুঁইতে পৌঁছে গেলাম। সবাইকে ঘটনাটা বলতে আমার কলিগরা বেশ খুশি হল। বুমবুমের তো অনেক বুদ্ধি।

খাওয়াদাওয়ার এখনো মেলা বাকি। গোল হয়ে আমরা কজন মাটিতে বসে পড়লাম। সিম্মান, আমার এক সহকর্মী বুমবুমকে বলল—

'তোমার বুদ্ধি তো বেশ। ধর যে চৌরাস্তাটা দেখলে সেটা একটা তিন রাস্তার

মোড়। আর কোনো সাইনবোর্ডও সেখানে নেই। তবে পথ দেখানোর জন্য দু জন লোক, দু ভাই সেখানে দাঁড়ানো।' সিম্মান মনে হয় কোনো ধাঁধা বলছে। আমরা শুনছি। 'এই দুই ভাইয়ের একজন সব সময় সত্য কথা বলে, অপরজন মিথ্যা কথা বলে। মোড়ে এসে ওদের যে কোনো একজনকে একটা মাত্র প্রশ্ন করে তুমি জুঁইয়ের রাস্তাটা বের করে নিতে পারবে?' সিম্মান থামল।

বুমবুম চুপ। আমি মনে মনে জপছি—আল্লাহ আমার মান-ইজ্জতটা রেখো।

'হ্যাঁ, পারা যাবে।' বুমবুমের আত্মবিশ্বাসী গলাটা আমি চিনি। 'আমি যে কোনো একজনকে বলব—'তোমার ভাইকে যদি জুঁই কটেজের রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে বলি তা হলে সে কোন রাস্তাটা দেখাবে?'

সিম্মান বলল—'তুমি কি দেখানো রাস্তায় যাবে?'

'না'। বুমবুম বলল—'আমি তার দেখানো পথের উলটো দিকেরটাতেই যাব।'

'ভেরি গুড। তুমি সত্যিই জিনিয়াস।' সিম্মান লাফিয়ে উঠল। 'আমি আশাই করি নি।'

আমি হাসলাম। 'দেখতে হবে না কার বোনপো।'

'বেশ বেশ।' দেখলাম আরো লোক জড়ো হয়েছে। সাদাফ ভাই আমাদের অফিসের ম্যানেজার। বললেন, 'আমি দুটো কাগজ নিয়ে এসেছি। এর একটাতে 'জয়' লেখা, অন্যটিতে 'পরাজয়'। বুমবুম, তুমি এখান থেকে 'জয়' লেখা কাগজটা তুলতে পারলে আজ আমরা সবাই তোমার কাছে হেরে যাব।'

সাদাফ ভাই যেমন পাজি। আমার মনে হয় দুটো কাগজে তিনি 'পরাজয়' লিখে রেখেছেন। কী জানি, বুমবুমটা একই চিন্তা করছে কি না।

'এটা খুবই সোজা।' বলেই বুমবুম একটা কাগজ তুলে নিল এবং সাদাফ ভাই কিছু বোঝার আগেই সেটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

'এ কী! কী করলে?'

'কেন।' বুমবুম বলল, 'আপনি বাকি কাগজটা নিন। তাতে যদি 'জয়' লেখা থাকে আমারটা 'পরাজয়' আর যদি 'পরাজয়' লেখা থাকে তবে আমারটা 'জয়'।

সাদাফ ভাই দেখলাম মুখ শুকনো করে ওই কাগজটা খুলে পড়লেন 'পরাজয়'। তার মানে বুমবুমের হয়েছে 'জয়'। আর সাদাফ ভাই স্বীকার করলেন, তিনি দুটোতেই 'পরাজয়' লিখে রেখেছিলেন। বুমবুমের কাছে জানতে চাইলাম, এটা সে জানল কী করে।

'না, শুধু আন্দাজ করেছিলাম কোনো ঘাপলা আছে।' বুমবুম বলল, কারণ জয়-পরাজয় লিখলে আমার জেতার সম্ভাবনা অর্ধেক। সেটা তিনি মানবেন কি না কে জানে, তাই।

বুমবুমের ওপর আমার আস্থাটা অনেক বেড়ে গেল। বাসায় ফিরে ওর বাবাকে সারা দিনের ঘটনা বলতেই দুলাভাই বললেন—

বুমবুমে রাখ আস্থা, বাতলে দেবে রাস্তা।

আর বন্ধুরা বলতে পার তেরাস্তার মোড়ে দু ভাইয়ের দেখানো রাস্তার উলটোটাতে কেন যেতে হবে?

ছুটির দিনে মামার বাড়ি

জ্যৈষ্ঠ মাসটা এসেই গেল। এ মাসেই আমাদের জাতীয় কবির জন্মতিথি। আবার এটিই মধুমাস। কারণ গ্রীষ্মকালীন ফলের মূল মৌসুম হল এই মাস। আম, লিচু কিংবা আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল সবই এখন বাজারে।

আমাদের বুমবুমেরও হাজারটা প্রশ্ন। লিচু কেন খুব কম সময় পাওয়া যায়? দেশী আম আর রাজশাহীর আমের মধ্যে পার্থক্য কী? রাজশাহীর আমগুলো কি দেশী আম নয়? ইত্যাদি।

দুলাভাইয়ের অবশ্য অনেক ধৈর্য। প্রায় দিনই ছেলেকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন। চেষ্টা করছেন আমের বিভিন্ন জাত চেনাতে। এখন বুমবুম প্রায় নির্ভুলভাবে আমের জাত চিনতে শিখেছে। বুমবুম আর ওর বাপের আমের এই বেসাতিতে আমার খুব পোয়াবারো অবস্থা। প্রতিদিনই বিভিন্ন রকমের আম চেখে দেখতে পারছি।

আমাকে যদি আমের জাত জিজ্ঞাসা করে, তা হলে বলি, 'আগে খেয়ে নেই। তারপর বলব।' সেদিনও রাতের খাওয়ার পর চলছিল আমপর্ব। দুলাভাই বলছিলেন তার আম বিষয়ক নানা অভিজ্ঞতা। এক ফাঁকে বুমবুমের মা বললেন, 'আম নিয়ে পিটুনি খাওয়ার কথা তো বললে না।'

'সে কী দুলাভাই', আমি বললাম, 'আম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন নাকি?'

'না না।' দুলাভাই বললেন, 'চুরি না করেও চোরের অপবাদ জুটেছিল কপালে।'

'কী রকম?'

দুলাভাই বললেন, আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। স্কুলের ছুটিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বড় মামার বাসায় গিয়েছি। বড় মামা তখন সেখানকার পুলিশ সুপার। তার বাড়িতে বিশাল আমবাগান। মামা, মামি ছাড়া আছেন রহিম মিয়া। আমি গিয়ে খুব ফুর্তিতে আম খেয়ে বেড়াচ্ছি।

বাগানে অনেক আম। খাওয়ারও লোক নেই। তাই প্রতিদিন মামি রহিম মিয়াকে দিয়ে বাজারে আম বিক্রি করতে পাঠাতেন। রহিম মিয়া দুটো ঝুড়িতে অনেক আম নিয়ে বাজারে যেত। একটি ঝুড়িতে ৬০টি পাকা আম ও অন্য ঝুড়িতে ৬০টি কাঁচাপাকা আম। রহিম মিয়া বিক্রি করত প্রতিজোড়া পাকা আম পাঁচ টাকা আর কাঁচাপাকা আম তিনটি পাঁচ টাকা। এভাবে প্রতিদিনই রহিম মিয়া আম বিক্রি করে টাকাটা মামিকে দিত।

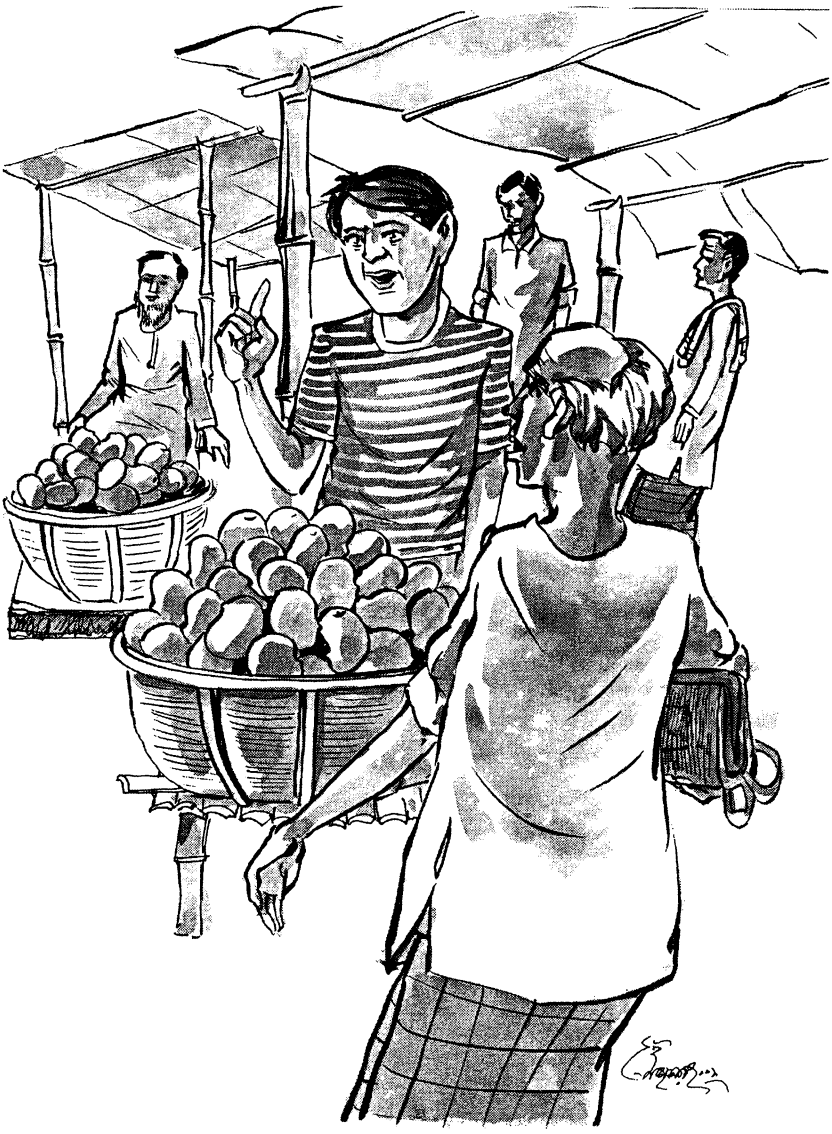

একদিন মামা অফিসে যাওয়ার সময় রহিম মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

আমি মামিকে বললাম, বাজারে গিয়ে আজ আম বিক্রির কাজটা আমি করতে পারি। মামি প্রথমে রাজি না হলেও পরে রাজি হলেন। বললেন, ঠিক আছে, আলাদা আলাদা বিক্রি করার দরকার নেই। তুমি হরে-দরে পাঁচটা আম ১০ টাকা হিসাবে বিক্রি করে এসো।

আমার তো প্রবল উৎসাহ। নিজেই ঝাঁকা নিয়ে বাজারে গেলাম। মোটামুটি দুপুরের আগেই পাঁচটা ১০ টাকা হিসাবে সব আম বিক্রি করে ফেললাম। বাসায় ফিরে সব টাকা মামিকে দিলাম।

মামি টাকা গুনে বললেন, আর টাকা আছে?

না। নেই।

তা হলে? এখানে তো ২৪০ টাকা। অথচ রহিম মিয়া প্রতিদিন আমাকে ২৫০ টাকা দেয়। বাকি ১০ টাকা কোথায়?

মামির চাহনি দেখে বুঝলাম, তিনি মনে করেছেন আমি ওই টাকা দিয়ে কিছু একটা করেছি। এখন স্বীকার করছি না।

যতই আমি বলি আমি টাকা নেই নি, সব টাকা মামিকে ফিরিয়ে দিয়েছি, তাতে তিনি বিশ্বাস করেন না। রাগে আমাকে একটু মারও দিয়েছিলেন।

আমারও খুব রাগ হল। রেগেমেগে দুপুরে খেলামও না। ভেবে রেখেছি, মামা এলেই তাকে বলে আমি পরদিনই বাড়ি চলে যাব। মামার বাগানের আম মনে হচ্ছিল টক!

সন্ধ্যায় মামা ফিরতেই মামি তাকে জানালেন, তার ভাগ্নে এই বয়সে একটি চোর হয়ে উঠেছে! মামা তো বিশ্বাস করেন না। আমি মামাকে সব কথা খুলে বললাম।

মামা জানতে চাইলেন, 'তুমি কত আম নিয়ে বাজারে গিয়েছিলে?'

বললাম, ৬০টি পাকা ও ৬০টি কাঁচাপাকা আম। আর প্রতি পাঁচটা ১০ টাকা হিসাবে বিক্রি করেছি। মামা সব হিসাব করে বললেন, না; তুই ঠিকই আছিস। মামিকে বললেন, 'ও টাকা চুরি করে নি। আম বিক্রি করে ও ২৪০ টাকাই পেয়েছে।'

মামি বললেন, 'রহিম মিয়া যে প্রতিদিন আমাকে ২৫০ টাকা দেয়। সেটা কীভাবে?' মামা বললেন, 'রহিম সব আম বিক্রি করে ২৫০ টাকা পায়। তাই সে তোমাকে ২৫০ টাকা দেয়।'

'এটা কীভাবে সম্ভব? ১২০টা আম বিক্রি করে রহিম মিয়া পায় ২৫০ টাকা আর ও ২৪০ টাকা!'

হ্যাঁ সম্ভব। মামা যখন বুঝিয়ে দিলেন তখন আমি আর মামি ঠিকই বুঝতে পারলাম।

দুলাভাইয়ের গল্প শুনে আমি কিন্তু ফাঁকটা ধরতে পারলাম না। বললাম, কীভাবে এটা সম্ভব হল তা কি বলবেন না?

দুলাভাই তখন তার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'বুমবুম। তুমি কি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছ?'

'মনে হয় বাবা।' বুমবুম বলল। আর এমনভাবে আমার দিকে তাকাল তাতে বুঝলাম অঙ্কটা খুবই সোজা। আমিই বোকা।

তারপরই সে ব্যাখ্যা করল। আমিও বুঝলাম।

বন্ধুরা, তোমরা কি বলতে পার ব্যাপারটা কীভাবে সম্ভব?

জন্মদিনের স্বপ্ন

বুমবুম চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিন জন বলে উঠলাম, 'শুভ হোক তোমার জন্মদিন। হ্যাপি বার্থ ডে।'

আজ বুমবুমের জন্মদিন। আমি, আপা ও দুলাভাই তাই ভোরে বুমবুমের বিছানার সামনে হাজির, ফুল আর উপহার নিয়ে। হেসে বুমবুম আমাদের মিষ্টি ধন্যবাদ দিয়ে ওর উপহারগুলো নিল। কিন্তু প্যাকেট খুলল না। তারপর ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা টি-শার্ট তাই না!' ওর মা দেখলাম হাসল। এবার বাবাকে, 'মনে হচ্ছে *হোয়াট ইজ দি নেম অফ দিস বুক* অথবা *এলিস ইন দি পাজল ল্যান্ড*।' দুলাভাই ছেলের পিঠ চাপড়ে বলল, 'দুটোই।' আমাকে একেবারে হতবিহ্বল করে বলল, 'সিডিতে বিশ্বকোষ। এনকার্টা?' আমি এতই অবাক হয়েছি যে, কোনো কথাই সরল না মুখ দিয়ে। আপা-দুলাভাই হইহই করে উঠল। আমি শুধু জানতে চাইলাম, 'কীভাবে বুমবুম।'

'স্বপ্নে পেয়েছি।'

'তার মানে?'

'বিকেলে বলব।' সারাদিন আমার অফিসে ভালোমতো মন বসল না। কীভাবে বুমবুম স্বপ্নে সব জানল?

সব মানুষই প্রতিদিন স্বপ্ন দেখে। তবে, সকালে উঠে স্বপ্নের কথা সবাই মনে করতে পারে না। কারণ, মানুষের মাথায় সবসময় নানা চিন্তা থাকে। ঘুম ভাঙলেই চেতন মন প্রথমেই বলে—ওঠ, গোসল কর, অফিসে যাও ইত্যাদি। শিশু-কিশোরদের এই ঝামেলা কম বলে তারা স্বপ্নের কথা মনে রাখতে পারে বেশি। ১৯৫৩ সালে ইউজিন সিরনস্কি নামের একজন বিজ্ঞানী প্রথম লক্ষ করেন, ঘুমানোর সময় শিশুদের চোখের পাতার নিচে চোখ খুব দ্রুত নড়াচড়া করে। এটিকে বলা হয়, চোখের দ্রুত ওঠানামা, র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট (আরইএম REM)। এখন ইইজি বা ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রামের সাহায্যে ঘুমন্ত মানুষের ব্রেনের তৎপরতা রেকর্ড করা যায়। এ রেকর্ড থেকে বিজ্ঞানীরা ঘুমের তিনটি প্রধান পর্যায় ভাগ করেছেন—তন্দ্রা, নন-আরইএম বা গভীর ঘুম ও আরইএম। এই তিন পর্যায়ে মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে, তবে আরইএম পর্যায়ে স্বপ্ন দেখার হার সবচেয়ে বেশি। এতসব জেনে বিকেলে বাসায় ফিরে বুমবুমের মুখোমুখি হলাম—'বল, আমাদের উপহারগুলো না দেখে কেমনে বলতে পারলি?'

'বাবা, খালাকে কি তুমি একটু বুঝিয়ে দেবে?" বুমবুম তার বাপের শরণ নিল।

'ব্যাপারটা খুব কঠিন নয়।' দুলাভাই বলছেন, 'স্বপ্ন হচ্ছে আমাদের মনের কল্পনার একটি চিত্র। এ ছাড়া দিনভর যেসব ঘটনা ঘটে তারও ছায়া পড়ে স্বপ্নে। স্বপ্ন আসলে একটি ব্রেইন-অ্যাকটিভিটি।'

'সেসব আমি জানি। কিন্তু তাতে বুমবুমের স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা তো পাচ্ছি না।'

'না পাওয়ার কিছু নেই।' দেখলাম আপাও যোগ দিয়েছে। 'প্রতিবছর ও জন্মদিনের কয়েকদিন আগে থেকে আমরা কী উপহার দিতে পারি তাই নিয়ে ভাবে। শেষ পর্যন্ত স্বপ্নে সেটাই দেখে। কোনোবার মেলে, কোনোবার মেলে না।'

'ঠিক তাই মা'। বুমবুম বলল, 'গত দুবার তুমি আমাকে শার্ট আর প্যান্ট দিয়েছ, তাই টি-শার্টের চিন্তাটা এসেছে। আর বাবা কদিন ধরে রেমন্ড স্ম্যালিয়নের গল্প করছে। তাই তার দুটো বইয়ের নাম ভেবেছি।'

'বুমবুমকে আমি ফ্রেডরিক কেকুলের গল্পটা বলেছি।' দুলাভাই বললেন, 'কেকুল কিছুতেই বেনজিন অণুর গঠন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। একদিন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখলেন, একটি সাপ নিজেরই লেজ কামড়ে খাওয়ার চেষ্টা করছে। এই থেকে তিনি বেনজিনের বলয় কাঠামো সম্পর্কে নিশ্চিত হন। সেরকম নোবেল বিজয়ী অটো

লিউরিং রাসায়নিক চিকিৎসা পদ্ধতি কিংবা এলিয়াস হাউয়ির সুইংমেশিন আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে স্বপ্নের অবদান।'

তাই তো। আমারও মনে পড়ল, স্যামুয়েল কোলরিজের বিখ্যাত কবিতা *কুবলা খান*, রবার্ট লুই স্টিভেনসনের *স্ট্রেঞ্জ কেস অফ ড. জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড*-এর অনুপ্রেরণাও স্বপ্ন।

আপাও যোগ দিলেন, বিটলসের বিখ্যাত 'ইয়েস্টার ডে' গানটিও কিন্তু স্বপ্নে পাওয়া।

'ঠিক'। দুলাভাই বললেন, 'এসব ঘটনা থেকে দেখা যায়, মানুষ আসলে তার স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মালয়েশিয়ায় একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আছে, সিনই নাম। তাদের রয়েছে স্বপ্ন-সংস্কৃতি। প্রতিদিন সকালে পরিবারের সবাই নিজেদের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করে। শিশুদের কেউ যদি দেখে স্বপ্নে তাকে বাঘ তাড়া করছে, তা হলে বাকিরা পরামর্শ দেয় স্বপ্নের বাঘের কোনো জোর নেই। আগামীদিন তুমিই তাকে আঘাত করবে। তারপরও যদি সে স্বপ্নের বাঘকে হারাতে না পারে, তখন অন্যরা তার 'স্বপ্নবন্ধু' হয়। অর্থাৎ রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওই শিশু ভাবে, আজ বাঘ এলে আমার স্বপ্নবন্ধু আমাকে সাহায্য করবে। এইভাবে সিনয় সম্প্রদায়ের লোকেরা দুঃস্বপ্নকে জয় করতে পারে।'

'তবে'। আপা বলল, 'স্কুলে উঁচু ক্লাসের কোনো ছেলে বুমবুমকে প্রতিদিন পেটায়, তা হলে ওর স্বপ্নের দৈত্যকে আমরা কিছুতেই মুছতে পারব না। যদি না ওর পিটুনি খাওয়া বন্ধ হয়।'

'দুঃস্বপ্ন কিংবা ভয়ার্ত স্বপ্নকে জয় করার জন্য বিশ্বব্যাপী মনোবিজ্ঞানীরা এখন তাই স্বপ্নের কারণ অনুসন্ধানের কথাও বলেন।' দুলাভাই যোগ করলেন।

'স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব কি এখন আছে বাবা।' বুমবুম জানতে চাইল।

'সিগমুন্ড ফ্রয়েড প্রথম স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করান। তার তত্ত্ব এখন অনেকাংশে পরিমার্জিত হয়েছে। অধুনা স্বপ্ন নিয়ে সবচেয়ে বেশি গবেষণা করছেন প্যাট্রিসিয়া গারফিল্ড নামের একজন বিজ্ঞানী। আর ইন্টারনেটে রয়েছে স্বপ্নের বিশাল ভুবন। যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে ড্রিম লিখে সার্চ করলেই কয়েক হাজার ওয়েব সাইট পাওয়া যাবে।'

অনেকক্ষণ চুপ থেকে বুমবুমের মা বলল, 'তবে সব মানুষকে কিন্তু স্বপ্ন দেখতে হয়। এই স্বপ্ন তার ভবিষ্যতের। যে তার ভবিষ্যতের স্বপ্নকে যত জোরালো করতে পারে, তার জন্য সে অর্জন সহজ হয়ে পড়ে, তাই না।'

'কিন্তু বুমবুম—' আমি বললাম, 'এসব থেকে বুঝলাম তুই কীভাবে বাবা ও মায়ের উপহারের কথা জানলি। কিন্তু আমার তো এবারই প্রথম?'

বুমবুম হাসল। 'সব সময় চিন্তা করে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। তাই, কাল রাতের বেলায় তোমার ঘরে কাগজের ঝুড়িটা দেখেছিলাম। সেখানে ওই দোকানের রসিদটা পেয়েছি, যেখান থেকে তুমি এনকার্টার সিডিটা কিনেছ। এবার বুঝলে তো?'

তা আর বলতে!

ইঁদুর মারতে আমায় কহ যে, ইঁদুর যায় না মারা সহজে

আমাদের বাসায় কদিন ধরে ইঁদুরের উৎপাত বেড়েছে। প্রতিদিন সকালেই ইঁদুরগুলোর কোনো না কোনো কুকীর্তির খবর পাওয়া যাচ্ছে। রান্নাঘর সামলাতে আপার বেশ কষ্টই হচ্ছে বলা যায়। দুলাভাই এ পর্যন্ত কয়েক রকম ইঁদুর মারার ওষুধ কিনে এনেছে। কিন্তু সাফল্যের হার বলার মতো নয়।

খাবার টেবিলে আলাপ হচ্ছিল ঐ ইঁদুর নিয়ে। দুলাভাই বলল 'দেখ। ইঁদুর তো তোমার সামান্য ক্ষতি করছে। গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলে বলে ইঁদুর মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তোমরা বরং লাঠি দিয়ে ইঁদুর মারা যায় কি না দেখ।' শেষের কথাটা অবশ্য আমাদের সবাইকে বলা।

'শুধু কি খাবার নষ্ট।' বুমবুম বলল।' ইঁদুর তো প্লেগের জীবাণু বহনকারী। তাই না বাবা?'

'হ্যাঁ। ইঁদুরের জন্যই প্লেগ মহামারী আকারে ছড়াতে পারে।' আমি বললাম, 'ইঁদুর মারার সবচেয়ে সহজ বুদ্ধিটা আমরা কেন প্রয়োগ করছি না?'

'সহজ বুদ্ধি?' আপার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। বিড়াল।' আমি বললাম। 'ঘরে একটা বিড়াল পুষলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

'তারপর ঐ বিড়ালকে মারার জন্য কুকুর আনতে হবে।' আপা একেবারেই বিরক্ত। 'ঘরে কোনো বিড়াল আনা চলবে না।'

'কুইনাইন জ্বর সারাবে বটে, তবে কুইনাইন সারাবে কে।' দুলাভাই বিড়বিড় করে বলল।

'তবে।' বুমবুম আমাকে বলছে। 'খালা, বিড়াল দিয়ে ইদুর মারা কিন্তু সহজ নয়।'

'কেন?' আমি একটু অবাক হয়েছি।

'যেমন ঐ হিসাবটা।' বুমবুম বলল। 'যদি তিনটে বিড়াল তিন মিনিটে তিনটে ইঁদুর মারতে পারে তা হলে এক শ মিনিটে এক শ'টা ইদুর মারতে কয়টা বিড়াল লাগবে?'

'দূর।' আমি বললাম।' এটা তো সোজাই। ঐ তিনটে বিড়ালই এক শ মিনিটে এক শ'টা ইঁদুর মেরে সাফ করে ফেলবে। তাই না?'

'অঙ্কের নিয়মে তোমার কথাই ঠিক, খালা।' বুমবুমটা বিজ্ঞের মতো বলল—'কিন্তু এক শ'টা ইঁদুর মারা তত সহজ নয়।'

'কেন নয়।' আমি বললাম।

'কারণ তুমি ধরে নিয়েছ তিনটে বিড়ালই একসঙ্গে একটা ইঁদুরকে তাড়া করছে, এক মিনিটে সেটিকে সাবাড় করে অন্যটিকে তাড়া করছে।'

'হ্যাঁ। তাতে অসুবিধাটা কী হয়েছে।' আপাও ইঁদুরের আলোচনায় ঢুকে পড়েছে।

'না, না। অসুবিধা হবে কেন?' বুমবুম বেশ জোরেই বলল। 'আমি বলছিলাম যদি প্রত্যেকটা বিড়াল আলাদাভাবে একটা ইঁদুরকে তাড়া করে এবং তাতে যদি তিন মিনিট করে সময় নেয় তা হলে কী হয়?'

বুমবুম একটু থেমে আবার বলল—'তা হলেও কিন্তু তিন মিনিটে তিনটে বিড়াল তিনটে ইঁদুর মারতে পারে, তাই না?'

এবার দুলাভাই বলল, 'বুমবুমের কথায় যথেষ্ট যুক্তি আছে।'

'এখন আমরা এক শ'টা ইঁদুর মারতে চাই।' বুমবুমের এই ভঙ্গিটা আমার চেনা। 'বিড়ালগুলো যদি যৌথভাবে তিনটে মিলে একটাকে না মারে, তা হলে সেগুলো প্রত্যেকে

আলাদা আলাদাভাবে ইঁদুর মারতে লেগে যাবে। বেশ, তা হলে প্রথমেই একটি বিড়ালের ভাগে ৩৩ (তেত্রিশ) টা করে ইঁদুর পড়বে। যেহেতু একটা মারতে তিন মিনিট কাজেই একটা বিড়াল ৩৩টা মারবে ৩ ×৩৩ = ৯৯ মিনিটে। বিড়াল ৩টা কাজেই ৯৯ মিনিটে ৯৯টা ইঁদুর মারা খতম।'

ছেলের পাণ্ডিত্যে এখন আপা-দুলাভাই দুজনই মুগ্ধ। দুলাভাই তো দেখলাম খুশিতে একেবারে ডগমগ।

'এখন তা হলে শেষ ইঁদুরটা আমাদের সমস্যা?' বুমবুম বলল।

'কী রকম?' আমরা জানতে চাইলাম।

'ঐ ইঁদুরটাকে যদি একটা বিড়াল মারে আর বাকি দুটো লেজ গুটিয়ে বসে থাকে তা হলে লেগে যাবে আরো তিন মিনিট। অর্থাৎ ১০০টা ইঁদুর মারতে মোট সময় লেগে যাবে ৯৯ + ৩ = ১০২ মিনিট।' বুমবুম বলল। 'তখন কিন্তু এক শ মিনিটে এক শ'টা ইঁদুর মারা যাচ্ছে না। অন্তত তিনটে বিড়াল দিয়ে নয়।'

'বা, তা হবে কেন?' আমি একটু মাথা খাটালাম। 'তিনটে বিড়াল একসঙ্গেই তো একটা ইঁদুরকে মারতে পারে। সেক্ষেত্রে কাজটা এক মিনিটে সম্পন্ন হতে পারে।'

'হয়তো পারবে।' বুমবুম বলল। 'তবে সেটা তুমি জানছে কীভাবে। আমাদের শুরুর শর্ত তিন মিনিটে তিনটে ইঁদুর মারাটা আমরা আলাদাভাবে পূরণ করেছি। একসঙ্গে ধরলে কী হবে তা তো বলা হয় নি?'

'কথা ঠিক।' দুলাভাই বলল। 'কাজেই তিনটে বিড়াল দিয়ে এক শ'টা ইঁদুর এক শ মিনিটে মারা যাবে না।'

আপা বলল—'একটা বাড়তি বিড়াল নিলেই তো হয়।'

'তা তো হয়, মা।' বুমবুম হাসছে। 'কিন্তু চারটে বিড়াল আমাদের হিসাবে পঁচাত্তর মিনিটেই এক শ'টা ইঁদুরকে সাবাড় করে দেবে।'

'তাতে কী।' আপা বলল, ৭৫ মিনিট পরে খোঁজ না নিয়ে, আমরা এক শ মিনিট পরে খোঁজ নিলেই তো দেখব এক শ'টা ইঁদুর মরেছে।'

'কিন্তু, সেটা তো ঠিক হবে না।' আমিই বললাম।

দুলাভাই আপাকে বলল—দেখ এবার। আমাকে তুমি যে বল, ইঁদুর মারার ভালো ওষুধ আনতে, আমি পারি না। এবার বুঝলে তো ইঁদুর মারা মোটেই সহজ কোনো কাজ নয়।'

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর

বুমবুমের মন ভালো নেই। সে জন্য আমারও মন খারাপ। দুলাভাই বলছে—অতটা মন খারাপ করার কারণ নেই।

ঘটনা ঘটেছে বুমবুমের স্কুলে। আজ ছিল ওদের স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বাছাইয়ের দিন। বুমবুমের মাত্র একটা ইভেন্ট—একটা দূরপাল্লার দৌড়। স্কুলের মাঠে মোট পাঁচ চক্কর। বাছাইয়ে বুমবুম টিকেছে। তবে, সামনের দিকে থাকতে পারে নি। ও হিসেব করে দেখেছে, ফাইনালে ওর পক্ষে প্রথম তিন জনের মধ্যে থাকা সম্ভব হবে না। ওর বাবার অবশ্য ভিন্ন মত। বাছাইয়ে দৌড়াতে হয়েছে মোটে তিন চক্কর। আর ফাইনালে দৌড়াতে হবে পাঁচ চক্কর। কাজেই বাছাইয়ে যারা প্রথম-দ্বিতীয় হয়েছে তারাই যে শেষ পর্যন্ত প্রথম-দ্বিতীয় হবে এটা ভাবা ঠিক নয়। চেষ্টা করলে বুমবুমও পারবে।

'দৌড় প্রতিযোগিতার কথা হলে আমাদের একটা চিরন্তন দৌড়ের কথা মনে পড়ে।' আপাও এসে হাজির হয়েছে আমাদের আড্ডায়।

'কোন্ দৌড়—খরগোশ ও কাছিমেরটা তো।' আমি বললাম।

'হ্যাঁ।' আপা বলল, 'ধীরস্থির হওয়াতে কাছিম সেদিন জিতে গেছল।'

'ওটা তোমাদের সময়কার পচা গল্প। ব্যাটা খরগোশ ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে কাছিম জিতেছে।' বুমবুম বলল। 'যদি খরগোশ না ঘুমাত তা হলে কাছিম কোনোদিনও জিততে পারত না। বুঝলে, বুড়োরা। এখনকার দৌড়ে কেউ ঘুমায় না?'

'থাক, থাক। আর বড়দের ভুল ধরতে হবে না।' দুলাভাই বলল—বরং ঐ গল্পটাকে একটু আধুনিক করা যায় কি না, আমরা দেখি।'

'কীভাবে, বাবা?'

আমরাও নড়েচড়ে বসলাম।

দুলাভাই বলতে শুরু করল—'খরগোশ জেগে উঠে দেখল কাছিম অনেক এগিয়ে গেছে, তবে ফিনিশিং লাইন অনেক দূরে। খরগোশ সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়ানো শুরু করল।'

'তা হলে একটু পরেই তো খরগোশ কাছিমকে ধরে ফেলবে।' আপা বলল।

'না, অত সোজা না। খোরগোশ দৌড় শুরু করার সময় কাছিম যেখানে ছিল কিছুক্ষণ পর খরগোশ সেখানে পৌঁছুবে। কিন্তু এ সময়ে কাছিম তো আর বসে থাকবে না? সে সামনে এগিয়ে যাবে, দ্বিতীয় একটি অবস্থানে। কিছুক্ষণ পর খরগোশ কাছিমের দ্বিতীয় অবস্থানে আসবে, কিন্তু ততক্ষণে কাছিম চলে যাবে নতুন, তৃতীয় অবস্থানে।

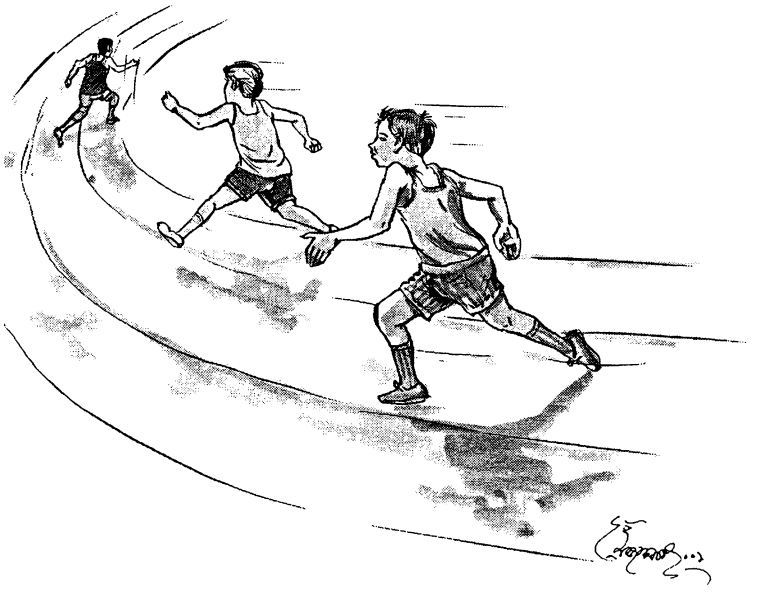

কাছিমের এই অবস্থানগুলোর দূরত্ব কমতে থাকবে প্রতিনিয়ত। কারণ খরগোশের গতি বেশি বলে তার প্রতিবারেই কম সময় লাগবে। কিন্তু, এই দূরত্বটা কমতে থাকলেও তা কখনো শূন্য হবে না, কেননা সেক্ষেত্রে খরগোশকে শূন্য সময়ে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয়। অর্থাৎ অসীম সময় ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে আর খরগোশও কাছিমকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না।' দুলাভাই একটু থামতেই আপা একেবারে তেড়ে আসল— 'তুমি বলতে চাও, খরগোশ পেছন থেকে দৌড়ে কাছিমকে অতিক্রম করতে পারবে না?'

'না–না। আমি কিছুই বলছি না।' আপার আক্রমণে দুলাভাই তাড়াতাড়ি বললেন। 'গ্রিক দার্শনিক জেনার এই যুক্তিটা প্রথম দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—তুমি যদি আগে থেকে এগিয়ে থাক, তা হলে কঠিন কোনো দৌড়বিদ, কার্ল লুইস বা মরিস গ্রিন কেউই তোমাকে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবে না।'

'দূর। জেনার যুক্তিতে নিশ্চয়ই ফাঁক আছে।' আমি বললাম। 'আমরা তো প্রায়শ দেখি দৌড়বাজরা পেছন থেকে অন্যদেরকে অতিক্রম করে যায়। আজো একটা ছেলে পেছন থেকে বুমবুমকে ফেলে এগিয়ে গেছে।'

'আমি মনে হয় ব্যাপারটা ধরতে পেয়েছি, বাবা।' বুমবুমের গলা। 'সম্ভবত গণিতের অসীম রাশিমালা সংক্রান্ত।' দুলাভাই হাসছে।

বুমবুম বলে চলেছে—'আমরা এরকম পড়েছি। একটা অসীম রাশিমালার কোনো কোনোটির যোগফল সসীম হতে পারে। অর্থাৎ কাছিমের অসীম দূরত্বের যোগফল সসীম হবে। আর সসীম হলেই সেটি অতিক্রম্য।'

'তোমাদের বাপ-বেটার এই অসীম-সসীম কি আমাদের একটু বুঝিয়ে বলবে।' আপার কৌতূহল।

দুলাভাই বুঝিয়ে বললেন।—'ধর, তোমার এক মিটার লম্বা একটা লাঠি আছে। প্রথমে এটাকে দু টুকরো কর। এবার, দু টুকরোর একটাকে ফের দু টুকরো কর। এভাবে প্রতিবারে একটি খণ্ডকে দু টুকরো করতে থাক। বলা হয়, এভাবে তুমি এক মিটার লম্বা লাঠিকে অসীমসংখ্যক টুকারোয় ভাঙতে পারবে।'

বুমবুমও যোগ দিল। 'এখন যদি এই অসীমসংখ্যক টুকরোগুলো আমরা ফের জোড়া লাগাই, তা হলে লাঠিটা লম্বায় কত হবে?'

'কেন। এক মিটার।' আমি বললাম।

'এই তো মাথা খুলেছে।' দুলাভাই বলল।'

'লাঠি-ভাঙা ও জোড়ার ঘটনাকে গাণিতিকভাবে নিচের মতো করে লেখা যায়—

$$\frac{১}{২} + \frac{১}{৪} + \frac{১}{৮} + \frac{১}{১৬} + \frac{১}{৩২} + - - - - \text{ অসীম পর্যন্ত } = ১$$

কাজেই, এভাবে অসীম ধারার যোগফল হতে পারে সসীম।'

আমরাও বুঝলাম কেন খরগোশ পেছন থেকে কাছিমকে ফেলে এগিয়ে যেতে পারে।

অসীম পর্যন্ত সময় খণ্ডগুলোকে যোগ দিয়ে যে সসীম সময় হবে, সে সসীম সময়ে খরগোশ কাছিমকে অতিক্রম করে যাবে।

সীমার মাঝে অসীমের লুকিয়ে থাকার এই ব্যাপারটি গ্রিক দার্শনিক জেনার জানতেন না বলে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তোমরা আশা করি হচ্ছ না।

গুণ ভাগের রকমফের

স্কুলে বইয়ের অভাবে পড়াশোনা তেমন একটা নেই। বছরের শুরু। এমনিতেই চাপ কম। বুমবুম প্রায়শ আবদার করে এদিক-সেদিক বেড়াতে যাওয়ার। ওর মা'র তো পায়ের নিচে চাকা লাগানোই আছে। কাজেই আমরা প্রায়শ বেরিয়ে পড়ছি এদিক-সেদিক। সেদিন ঘুরে এসেছি মুড়াপাড়া থেকে। মুড়াপাড়া আসলে একটা বড়সড় গ্রাম। ঢাকা থেকে ২৫-৩০ কিলোমিটার দূরে। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানায় পড়েছে। দেখতে গিয়েছিলাম সেখানকার রাজবাড়ি। মুড়াপাড়ার রাজবাড়িটা এখন মুড়াপাড়া ডিগ্রি কলেজ। কলেজের সামনে বিশাল মাঠ। তারপর একটা দিঘি। মা-ছেলে দেখলাম দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে খুব আফসোস করল, কেন তারা প্রস্তুতি নিয়ে আসে নি, তা হলে সাঁতার কাটতে পারত! আমার অবশ্য তেমন ইচ্ছে হয় নি। কারণ আমি সাঁতার জানি না।

খাবারদাবার নিয়ে এসেছি। কলেজের মাঠে বসেই আমরা খাওয়াদাওয়া সারছি।

'জায়গাটা খুব সুন্দর।' আপা বলল—'ঢাকা থেকে বেশি দূরেও না। কত দূরে যেন?' শেষ প্রশ্নটা দুলাভাইকে করা।

'আমাদের বাসা থেকে ২৮ কিলোমিটার।' দুলাভাই জানাল।

'ঐ তোমাদের কিলো-টিলো আমি বুঝি না। মাইলে বল!' আপার প্রশ্ন শুনে বুমবুম ঝটপট বলে উঠল—প্রায় সাড়ে সতের মাইল।'

একেবারে সাড়ে দিয়ে বলাতে আমার একটু সন্দেহ হল। দুলাভাই-র দিকে তাকালাম। মাথা নেড়ে দুলাভাই ছেলের পক্ষে সায় দিল।

এক মাইলে প্রায় ১.৬ কিলোমিটার এটা আমি জানি। কিন্তু বুমবুম এই জটিল ভাগটা এত সহজে করল কেমনে?

খাওয়াদাওয়ার পর ওকে চেপে ধরলাম। 'বাসা থেকে নিশ্চয়ই অঙ্ক করে এসেছিস। নইলে সাড়ে সতের মাইল বললি কেমনে?'

'ওহ হো খালামণি! তুমি যে কী?' বুমবুমের বিরক্তি। 'এত সহজ একটা হিসাব আবার বাসা থেকে করে আসতে হবে।'

'১.৬ দিয়ে ভাগ বুঝি সহজ?' আমি বললাম।

'দূর।' বুমবুম বলল। 'তোমাকে একটা সহজ বুদ্ধি বলে দিচ্ছি কিলোমিটারকে মাইল বানানোর।' তারপর বুমবুম আমাকে কত সহজ একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিল।

প্রথমে কিলোমিটারের অর্ধেক করতে হবে। তারপর এই অর্ধেকের সঙ্গে যোগ

করতে হবে অর্ধেকের সিকি ভাগ। তা হলেই মাইল পাওয়া যাবে। যেমন ধর ৮০ কিলোমিটারে কত মাইল? আমরা প্রথমে নেব ৮০-এর অর্ধেক ৪০। ৪০-এর সঙ্গে যোগ দেব ৪০-এর সিকি ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ (৪০÷ ৪=১০)। অর্থাৎ ৪০+১০=৫০। তা হলে ৮০ কিলোমিটারে হয় ৫০ মাইল। ঐ হিসাবে বুমবুম ২৮ কিলোমিটারে (১৪+৩.৫) =১৭.৫ মাইল বের করেছিল।

আমি কিছুদিন যাবৎ বাপ-বেটার এইসব বুদ্ধি টের পাচ্ছি। বড় বড় গুণ ভাগ এরা কত সহজে করে ফেলে এসব বুদ্ধি খাটিয়ে। দেখি আজকে আর কিছু বের করা যায় কি না।

বাজবাড়ির চারদিকটা ঘুরে আবার দিঘির পাশে এসে পড়েছি। আপা ঘাটের সিঁড়িতে বসে আছে। দুলাভাইকে দেখছি না।

ছেলেকে দেখে আপা বলল—তাড়াতাড়ি বল তো ১৭৯কে ৯৯ দিয়ে গুণ করলে কত হবে?'

আমাকে অবাক করে বুমবুম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জানাল—সতের হাজার সাত শ একুশ। আমার অবাক চাহনি দেখে বলল—নিরানব্বই-এর গুণ খুব সোজা। প্রথমে যে সংখ্যাকে গুণ করতে হবে তার পাশে দুটো শূন্য বসাও। তারপর নতুন সংখ্যা থেকে প্রথম সংখ্যাটা বাদ দাও। তা হলেই মিলবে উত্তর।

'ঠিকই আছে।' দুলাভাই এসে পড়ছে—'আসলে বুমবুম চলতি নিয়মে গুণ করেছে। সংখ্যার পাশে দুটো শূন্য বসানোর অর্থ এক শ দিয়ে গুণ করা। তারপর সেখান থেকে ঐ সংখ্যা একবার বাদ দিলেই নিরানব্বই দিয়ে গুণ হয়ে যায়।'

(বাসায় ফিরে আমি দেখেছি ১৭৯০০-১৭৯ = ১৭৭২১=১৭৯ × ৯৯। আরো কয়েকটা সংখ্যা নিয়েও দেখেছি। তোমরাও দেখতে পার।)

দুলাভাই দেখলাম কয়েকটা কাগজ আর কলম নিয়ে এসেছে। আমরা কিছুক্ষণ গল্প করে, তারপর কাছেই রাসেল পার্ক ও মিনি চিড়িয়াখানা দেখে বাড়ি ফোরার প্ল্যান করলাম।

'গল্প কী। আমি বরং তোমাদের একটা ম্যাজিক দেখাই।' বুমবুমটার ইদানীং খুব ম্যাজিক দেখানোর ইচ্ছে।

'খালামণি। তোমার কাগজে তুমি একটা সংখ্যা লেখ, তিন অঙ্কের।'

লিখলাম।

'এবার ঐ সংখ্যার পাশে আবার ঐ সংখ্যাটা লেখ। তা হলে একটা ছয় অঙ্কের সংখ্যা পাবে। তারপর কাগজটা মা'কে দাও।'

আপাকে কাগজটা দিলাম।

'মা। তুমি সংখ্যাটাকে ১১ দিয়ে ভাগ কর।' বুমবুম নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে।

'১১ দিয়ে সব সংখ্যাকে সহজে ভাগ করা যায় না। না, এ দেখছি মিলে গেছে।' অঙ্ক করতে করতে আপা বলল।

'ভাগফলটা বাবাকে জানিয়ে দাও।' বুমবুমের কথামতো ওর মা কাগজটা দুলাভাইকে দিল।

'বাবা, তুমি এবার ভাগ কর ১৩ দিয়ে।'

'আমার ভাগে আনলাকি—১৩।' দুলাভাই বলল। 'না, এখন দেখা যাচ্ছে সংখ্যাটি লাকি। কারণ এবারো কোনো ভাগশেষ নেই।'

বুমবুমের কথামতো দুলাভাই কাগজ আমাকে ফেরত দিলেন।

'এবার খালামণি তুমি ভাগ কর ৭ দিয়ে।'

'করেছ। এবার শেষ ভাগফল লেখা কাগজটা আমাকে দাও।'

কাগজটা এক নজর দেখেই বুমবুম ঘোষণা করল—খালামণি তুমি শুরুতে এক শ ঊনচল্লিশ (১৩৯) লিখেছিলে, তাই না?'

বুমবুম একেবারে ঠিক বলেছে। আমি না করি কেমনে? বন্ধুরা তোমরা কি বুমবুমের কৌশলটা বুঝতে পেরেছ?

বুমবুম দি ম্যাজিশিয়ান

কদিন যাবৎ আমাদের সন্ধ্যাগুলো বেশ ফুর্তিতে কাটছে। এমনিতে বছরের শুরুতে আমার ব্যাংকে কাজকর্মে ঝামেলা কম। অফিস ছুটির পরপরই আমি বাসায় ফিরতে পারি। বুমবুমের স্কুলে পড়ার তেমন চাপ নেই। নতুন ক্লাসে উঠলেও বুমবুম এখনো হাতে বই পায় নি। কাজেই, ওর মা'র কাছে কিছুক্ষণ ইংরেজি পড়া আর সুযোগ পেলে ওর বাবার কাছে অঙ্ক করা—এই ওর পড়াশোনা।

প্রতিদিনই বুমবুমের বই খোঁজার জন্য দুলাভাই শহর চষে ফেলেন। প্রতিদিনকার মতো এসে আজো ঘোষণা করলেন— 'না। আজকেও পাওয়া গেল না।'

'আচ্ছা। এই যে ছেলেরা নতুন বই পাচ্ছে না। একটি মাস চলে গেল। ওদের কী হবে?' আপা জানতে চাইলেন।

'কী আর হবে?' আমি বললাম। 'মার্চ নাগাদ বই পাবে। তারপর শুরু হবে নির্বাচনী গ্যাঞ্জাম। এ বছর তো আবার ইলেকশন।'

'বই পাচ্ছি না আমি। আর যত চিন্তা তোমাদের।' বুমবুম বলল।

'তা তো হবে বাবা।' বুমবুমের বাবা বলল। 'নতুন প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ তো আমাদের বুড়ো প্রজন্মকেই করতে হবে। নাহলে তোরা আমাদের দুষবি যে।'

'যাক। আর মন খারাপ করে লাভ নেই।' আপা বললেন। 'তারচেয়ে নিজেরা মিলে গল্পটল্প কর। আমি বরং খাওয়াদাওয়ার খোঁজ নিই।'

'দাঁড়াও মা। এক্ষুনি যেয়ো না। আমি বরং তোমাদের একটা ম্যাজিক দেখাই, সবার মন ভালো হবে।'

সে কী! বুমবুম দেখি ম্যাজিশিয়ান হয়ে গেছে!

'বাবা তোমার ঘড়িটা খোল তো।' দুলাভাই-র উদ্দেশে বুমবুম বলল। তারপর নিজেই দুলাভাইয়ে কলম, মোবাইল ফোন আর ঘড়িটা হাতে নিল।

'এগুলো টেবিলের ওপর রাখলাম।' বুমবুম ঘোষণা করল। 'আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি। তোমরা তিন জন প্রত্যেকে একটা করে জিনিস নিয়ে লুকিয়ে রাখবে। তারপর আমি আসব।' এই বলে বুমবুম পাশের ঘরে চলে গেল।

বুমবুমের সব কাজেই ওর বাবার প্রবল উৎসাহ। কাজেই ঝটপট আমরা তিন জন তিনটে জিনিস নিয়ে লুকিয়ে রাখলাম।

হাতে একটা প্লেট নিয়ে বুমবুম হাজির। ওমা, একটা কালো টুপিও দেখি মাথায়

দিয়েছে। ম্যাজিশিয়ানদের মতো।

প্লেটে অনেক বাদাম।

'প্লেট থেকে তোমাদেরকে আমি কয়েকটা করে বাদাম দিচ্ছি।' এই বলে বুমবুম আপাকে দিল মাত্র একটা বাদাম, দুলাভাইকে দিল দুইটা আর আমাকে দিল তিনটে। আমরা হাত পেতে নিলাম।

'এবার মন দিয়ে শোন।' বুমবুম একেবারে ম্যাজিশিয়ানদের মতো করে বলছে। 'আমি আবার রুম ছেড়ে যাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে যে কলম নিয়েছ সে নেবে আমি যতগুলো বাদাম তাকে দিয়েছি ঠিক ততগুলো। যার হাতে কিনা বাবার ঘড়ি তাকে নিতে

হবে আমি তাকে যতটা দিয়েছি তার ডাবল। আর বাকি থাকে মোবাইলওয়ালা। মোবাইল যে নিয়েছ সে নেবে আমি যতটা দিয়েছি তার চার গুণ। বাকিগুলো প্লেটেই থাকবে। সবাই বুঝতে পেরেছ?'

ওর মা আবার বলতে বলাতে বুমবুম আবার বুঝিয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। আমরাও ওর নির্দেশমতো বাদাম তুলে নিলাম।

রুমে এসে বুমবুম বাদামের প্লেটের দিকে একবার তাকিয়েই বলল। 'প্রিয় সুধীমণ্ডলী, এবার দেখুন বুমবুম দি ম্যাজিশিয়ানের ম্যাজিক। মা তোমার কাছেই রয়েছে মোবাইল ফোনটা। খালামণির কাছে রয়েছে কলমটা। বাবার কাছে ঘড়ি। তাই না?'

আমি তো অবাক। দেখা গেল সবার কাছে ওর কথামতো জিনিসগুলো রয়েছে। আপা তো খুশিতে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমার একটু সন্দেহ হল। ও দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে ফেলে নি তো।

'তুমি যা ভাবছ তা সত্যি নয়।' বুমবুম আমার চোখ দেখে কি বলল। 'আমি মোটেই উঁকি দিয়ে দেখি নি।'

একটুক্ষণ চুপ থেকে দুলাভাই জানতে চাইল—'তোর প্লেটে শুরুতে কয়টা বাদাম ছিল রে?'

'আমি জানতাম তুমি বুঝে ফেলবে?' বুমবুম বলছে।' 'মাত্র চব্বিশটা বাবা।'

বাবা-ছেলের কথোপকথন আমি বা আপার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাই বললাম আমাদের খুলে বল।

তারপর বাপ-বেটাতে যা বলল তাতেই বুঝলাম আমাদের বুমবুমের ম্যাজিকে ম্যাজিশিয়ানের মতো কোনো হাত-সাফাই নেই। স্রেফ মগজ খেলানো।

বন্ধুরা, তোমরা কি বলতে পার বুমবুম কীভাবে এই ম্যাজিক দেখিয়েছিল?

শিকল পরা ছল মোদের

শিকল পরা ছল মোদেরই, শিকল পরা ছল

অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি অনেক রঙিন কাগজ নিয়ে মা-ছেলে কীসব করছে। দুজন দেখি গুনগুন করে গানও গেয়ে যাচ্ছে। একেবারে বিপ্লবী তেজী সঙ্গীত।

'বলি, ঘরময় এত রঙিন কাগজের সমাহার কেন? সামনে কি কোনো অনুষ্ঠান আছে?' জানতে চাইলাম। জানা গেল এই সামনেই বুমবুমের স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ঐ যে, যেটার বাছাইয়ে বেশি ভালো করতে পারে নি বলে বুমবুমের মন খারাপ ছিল। স্কুলে সব ক্লাসের সব ছাত্রকে চারটি হাউসে ভাগ করা হয়েছে। হাউসগুলো হল রবীন্দ্র হাউস, নজরুল হাউস, সত্যেন বোস হাউস ও কুদরাত-ই-খুদা হাউস।

'স্কুলের সব ছাত্রকে কীভাবে ভাগ করা হল?' আমার এই প্রশ্নের জবাবে বুমবুম জানাল স্কুল কর্তৃপক্ষ কত সহজে এই সমস্যার সমাধান করেছে।

রোল নম্বর অনুসারেই হাউসে বিভাজন। প্রত্যেকের রোল নম্বরকে চার (৪) দিয়ে ভাগ করা হয়। যার অবশিষ্ট ১ সে নজরুল, যার অবশিষ্ট ২ সে সত্যেন বোস আর যার অবশিষ্ট ৩ সে রবীন্দ্র হাউসের ক্রীড়াবিদ। সবশেষে যার রোল নম্বর ৪ দিয়ে বিভাজ্য সে কুদরাত-ই-খুদা হাউসের।

আমাদের বুমবুম নজরুল হাউসের ক্রীড়াবিদ। প্রতিযোগিতার দিন আবার প্রত্যেক হাউসকে তাদের তাঁবু সাজাতে হবে। বুমবুমরা ঠিক করেছে রঙিন কাগজ দিয়ে সুন্দর করে সাজাবে হাউস প্রাঙ্গণ। এই জন্য সবাই কাজ ভাগ করে নিয়েছে। বুমবুমের ভাগে পড়েছে রঙিন কাগজ কেটে আঠা দিয়ে জোড়া দিয়ে শিকল বানানোর কাজ।

কাগজের লম্বা শিকল।

মা আর ছেলে মিলে সেগুলোই বানাচ্ছে। একটু ফ্রেশ হয়ে আমিও সাহায্য করতে লেগে গেলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুলাভাই যখন ফিরল, ততক্ষণে আমাদের কাজ প্রায় শেষ। অনেক ক'টা লম্বা শিকল হয়েছে, স্কুলে নেওয়ার জন্য।

আমাদের সব দেখেশুনে দুলাভাই একটু হতাশ হয়ে বলল—আহা, একটু আগে আসলে আমিও কাজ করতে পারতাম।

বুমবুমের হাউসের গল্প শুনে দুলাভাই বলল—দেখ তো, ৪ একটা কত কার্যকরী সংখ্যা!

'হ্যাঁ, তা তো হবেই।' বুমবুম বলল। 'কত সহজে ছাত্রদের আমরা চার ভাগে ভাগ করে ফেললাম।'

'সে তা বটেই।' দুলাভাই বলে যাচ্ছে। '৪-এর অন্য বাহাদুরিও আছে। যেমন কোনো সংখ্যাকে যদি ২৫ দিয়ে গুণ করতে চাও, তা হলে সেটিকে ৪ দিয়ে ভাগ করলেই গুণফলটা পাওয়া যায়।'

সে কী! গুণ করার জন্য ভাগ! আমরা নড়েচড়ে বসলাম।

'যেমন ১১২৩কে যদি ২৫ দিয়ে গুণ করতে হয় তা হলে প্রথমে ১১২৩কে ৪ দিয়ে ভাগ কর।' দুলাভাই বলল।

'মিলল না তো।' বুমবুম হিসাব করেছে।

'না মিলুক। কত হল?'

'২৮০ ভাগফল আর ৩ অবশিষ্ট।' বুমবুম বলছে।

'বেশ তা হলে ১১২৩কে ২৫ দিয়ে গুণ করলে হবে ২৮০৭৫।' দুলাভাই হাসল।

'ঠিক হয়েছে।' বাপ-বেটার অঙ্ক কষা দেখে আপা ক্যালকুলেটর নিয়ে এসেছে।

'কীভাবে করলে, বাবা?' কৌতূহল বুমবুমের একার নয়।

'আসলে ৪ দিয়ে ভাগ করার পর ভাগফলের পাশে ভাগশেষ অনুসারে ০০, ২৫, ৫০ অথবা ৭৫ বসাতে হয়। যদি তোমার ভাগশেষ না থাকে তা হলে ০০; যদি ভাগশেষ থাকে ১ তা হলে ২৫, ২ থাকলে ৫০ আর যদি ৩ থাকে তা হলে বসাতে হবে ৭৫।' দুলাভাই আমাদের কৌশলটা শিখিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বুমবুম কাগজ নিয়ে কয়েকটা হিসেব করে ফেলল। তোমরাও দেখ।

	ভাগফল	অবশিষ্ট	গুণফল
৩৭ × ২৫ ⇒	৩৭ ÷ ৪ = ৯	১ ⇒	৯২৫
১২৮ × ২৫ ⇒	১২৮ ÷ ৪ = ৩২	২ ⇒	৩২৫০
৩৩৪৩ × ২৫ ⇒	৩৩৪৩ ÷ ৪ = ৮৩৫	৩ ⇒	৮৩৫৭৫

বেশ সোজা তাই না!

'অঙ্ক কষা অনেক হয়েছে।' আপা বলল। তার হাতে দেখি কয়েকটা শিকলের টুকরা। তারপর দুলাভাইকে বলল— 'কাজ করতে পার নি দেখে তোমার মন খারাপ। দেখ, কতগুলো ছোট শিকল পেয়েছি ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে। এগুলো দিয়ে একটা বড় শিকল বানিয়ে দাও ছেলেকে।'

আমরাও দেখলাম আপা নিয়ে এসেছে মোট ৫টি ছোট শিকলের টুকরা (ছবি দেখ) প্রত্যেকটাতে তিনটে করে রিং।

'তা একটার সঙ্গে আর একটা কী দিয়ে জড়াব। বাড়তি কাগজ দাও।' দুলাভাই বলল।

'সে তুমি পাচ্ছ না।' আপা বলল, 'তুমি বরং এগুলোকে খুলে ফের জোড়া দাও।'

একটু ভেবে দুলাভাই ছেলেকে ডাকলেন। 'আমরা ইচ্ছে করলে প্রথমটা বাদ দিয়ে

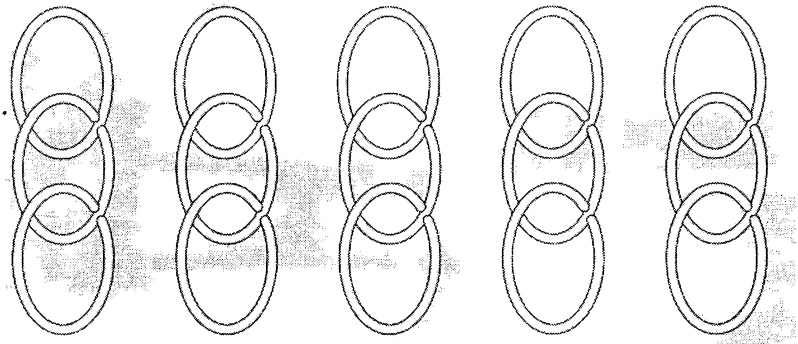

পরের চারটার একটা করে খুলে তা দিয়ে অন্যটার সঙ্গে জোড়া দিতে পারি। তা হলে শিকলটা তৈরি হয়ে যাবে, তাই না।'

আমিও দেখলাম। চারটে ছোট রিং খুলে জোড়া দিয়ে নিলে লম্বা শিকলটা তৈরি হবে।

'বাবা, একটু দাঁড়াও।' বুমবুম কি অন্য কিছু ভাবছে?

'আচ্ছা বাবা। চারটে না খুলে তিনটে খুলেও তো এটা করা যায়। তা হলে একটু কম কাজ করতে হয়।'

দুলাভাই কি একটু চমকালেন! আমি তো বেশ অবাক। আচ্ছা, তা হলে শুনি তোমার বুদ্ধি।

তারপর বুমবুমের কৌশল দেখে বুঝলাম তিনটে খুলেই এই কাজ করা যায়।

বন্ধুরা, তোমরা কি জান বুমবুমের কৌশলটা কী ছিল?

উপসর্গে জুড়লে তীর দেখা পাবে মহর্ষির

বাবা, মায়ের সঙ্গে বুমবুম বেড়াতে গিয়েছে সিলেটে। বাসায় তাই আমি একা। সময় কাটানোর জন্য আমি নিজেও আজকাল কোনো না কোনো খেলা খেলছি। মনে হয় এই বাড়ির বাতাস। প্রতিদিনই অফিস থেকে ফিরে আমার কাজ হল সেদিনের পত্রিকার শব্দ ধাঁধাটার সমাধান করা।

আমি 'শব্দভেদের' কথা বলছি। তোমাদের অনেকেই হয়তো এই খেলাটির সঙ্গে পরিচিত। পাশাপাশি ও ওপর–নিচ এভাবে কিছু সংকেত দেওয়া থাকে, তা থেকে কাঙ্ক্ষিত শব্দটি খুঁজে বের করতে হয়।

শব্দ খোঁজার এই খেলাটি এখন আমাদের দেশেও খুব জনপ্রিয়। প্রায় অধিকাংশ দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই আয়োজন দেখা যায়।

কোনো কোনো পত্রিকার শব্দ সন্ধান একজনই তৈরি করেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *আনন্দমেলা* পত্রিকার শব্দ সন্ধানটি তৈরি করেন দেব সেনাপতি। দেব সেনাপতি লেখকের ছদ্মনাম। কোনো কোনো পত্রিকায় আবার যে কেউ খেলাটি তৈরি করতে পারেন। যেমন *'প্রথম আলো'*। তবে সেক্ষেত্রে কেউ না কেউ পাঠকের পাঠানো ছকটি দেখে দেন।

এখনকার চৌকোনা ঘরটি বিশ্বের প্রায় সব দেশে প্রচলিত। তবে একেবারে প্রথম শব্দ সন্ধানটির ছক ছিল হিরের আকৃতির। আর্থার উইন নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক এটি বানিয়েছিলেন। ১৯২৩ সালের ২১ ডিসেম্বর 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় এটি ছাপা হয়েছিল। ঐ শব্দ ছকের ওপর–নিচ ও পাশাপাশি দুটো সূত্রেরই একই শব্দ হত। এরপর ১৯২৪ সালে ইংল্যান্ডের সানডে এক্সপ্রেসেও শব্দসন্ধান ছাপা হয়। এর পরপরই সারা বিশ্বে এটি ছড়িয়ে পড়ে।

শব্দসন্ধান কীরকম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তার কিছু গল্প শোনা যাক। ১৯২৬ সালে বুদাপেস্টের এক ওয়েটার আত্মহত্যার চিরকুটে শব্দভেদ লিখে যান। সমাধানের জন্য পুলিশ পত্রিকায় ঐ ছকটি ছাপায়।

জর্জ ব্লেক নামে এক গুপ্তচর ধরা পড়ে জেল খাটছিল। তার বন্ধুরা জেল থেকে পালানোর পদ্ধতি একটি ছকের মাধ্যমে তৈরি করে। সেই ছকটি ছাপা হয় লন্ডনের 'দি টাইমস' পত্রিকায়। ছক মিলিয়ে ব্লেক জেলখানা থেকে পালিয়ে যায়।

'দি টাইমস' পত্রিকার শব্দভেদ বা ক্রস ওয়ার্ডটি এখনো বিশ্বে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।

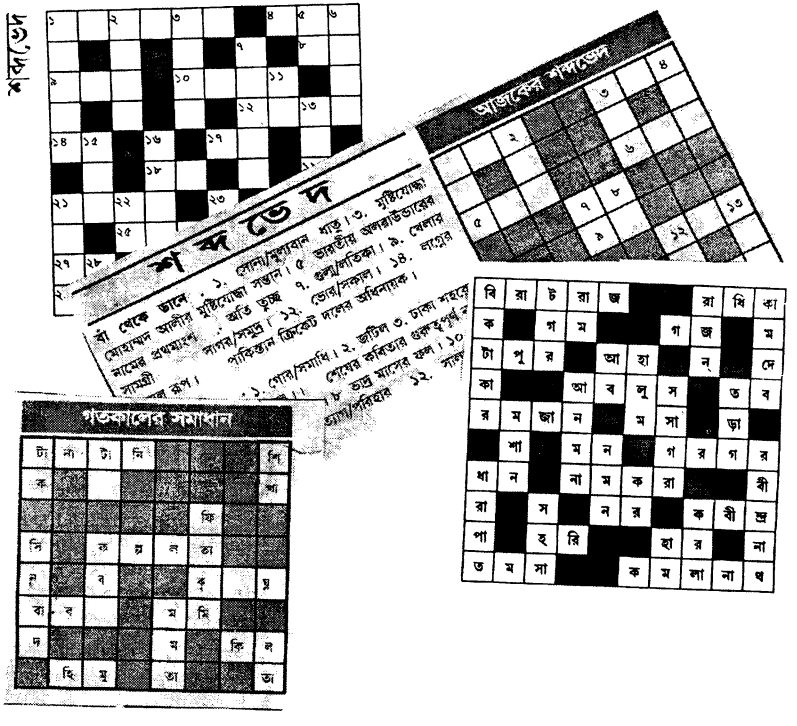

গুপ্তচর ব্লেকের ঘটনার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যারিসের পত্রিকাগুলো শব্দভেদ ছাপানো বন্ধ রাখে। শব্দভেদের সমাধান করার জন্য শুধু নিজের শব্দভাণ্ডারের আয়তন বাড়ালেই চলে না, খোঁজ রাখতে হয় সমসাময়িক ঘটনাবলি এবং খাটাতে হয় নানা কৌশল। নানা আকৃতির শব্দভেদের ছকের খোঁজ পাওয়া গেছে। দুই বছর চেষ্টা করে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ১৫ × ১৫ ×১৫ ছকের একটি ত্রিমাত্রিক ছক বানিয়েছিলেন। এতে মোট ঘর ছিল ৩ হাজার ৩৭৫টি।

শব্দভেদের সূত্রগুলো নানা রকমের হয়, যার একটি ব্যবহৃত হয়েছে এই লেখার শিরোনামে। শিরোনামে যে শব্দটি খোঁজা হচ্ছে, সেটি একজন ঋষির নাম এবং চার অক্ষরের। আশা করি তোমরা এর সমাধান করতে পারবে। যারা পারলে না তাদের জন্য এই লেখাটির শেষে ঐ ঋষির নাম দেওয়া হল।

শব্দভেদ যারা নিয়মিত সমাধান করেন, তাদের অনেকেরই এটি নেশার মতো হয়ে যায়। আমার এক বন্ধুরও এই অবস্থা। একদিন দুপুরে আমাকে বলেছে—'সকাল থেকে চেষ্টা করছি। এখন দুপুর তিনটে বাজে। দুপুরে খাওয়াদাওয়া হয় নি। কিন্তু এখনো সমাধান হল না যে।' শব্দভেদ করা ভালো তবে যদি তা আমার বন্ধুর মতো হয় তা হলে তুমি কখনো পরাশর মুনিকে খুঁজে পাবে না।

ম্যাজিক স্কোয়ারের কৌশল

বছরের শুরু। বুমবুমের নতুন ক্লাস। নতুন পড়া। এবার অবশ্য নতুন বইয়ের খবর নেই। তাই, অন্যদের পুরোনো বই যোগাড়ে বের হচ্ছে মা ও ছেলে প্রতিদিন। অবশ্য পুরোনো বই যোগাড় করে কী লাভ হবে? বুমবুমের বাবা বলছে এবারে সিলেবাস পাল্টে গেছে, তাই পুরোনো বই যোগাড় করে কোনো লাভ হবে না।

পড়াশুনার চাপ না থাকায় বুমবুম প্রায়শ আমার সঙ্গে গল্প করে। মাঝেমধ্যে তার দু'একটা কৌশলও আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। তার একটি আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি।

অঙ্কে ম্যাজিক স্কোয়ার তোমরা অনেকেই চেন। ১নং চিত্রের মতো একটি চৌকোনো বাক্স, তাতে ছোট ছোট চৌকোনা ঘর।

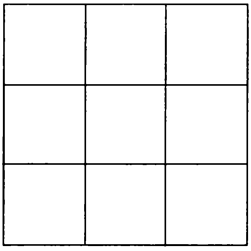

১নং চিত্র

ঐ চারকোনা ঘরের মোট ৯টি ঘরে ৯টি সংখ্যা এমনভাবে বসাতে হয় যেন আড়াআড়ি, সোজাসুজি, কোনাকুনি এবং উপর–নিচ যে কোনোভাবেই লাইনের যোগফলগুলো একই বা সমান হয়। যেমন ১নং চিত্রের ৯টি ঘরে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বসালে এর যে কোনো দিকের যোগফল হবে ১৫। অবশ্য অন্য যে কোনো পরপর ৯টি সংখ্যা দিয়ে এটি করা যায়।

এবারে বুমবুমের বুদ্ধি অনুযায়ী কেমনে এই ম্যাজিকে স্কোয়ার বানাবে তা জেনে নাও। প্রথমে ৩ সারিতে অঙ্কগুলো পরপর লেখ, ২নং চিত্রের মতো

১	২	৩
৪	৫	৬
৭	৮	৯

২নং চিত্র

এখন এর মধ্যে চৌকোনো বাক্স আঁকতে হবে। কায়দাটা হবে ৩নং চিত্রের মতো। আঁকার লাইনগুলো ভালোভাবে খেয়াল কর।

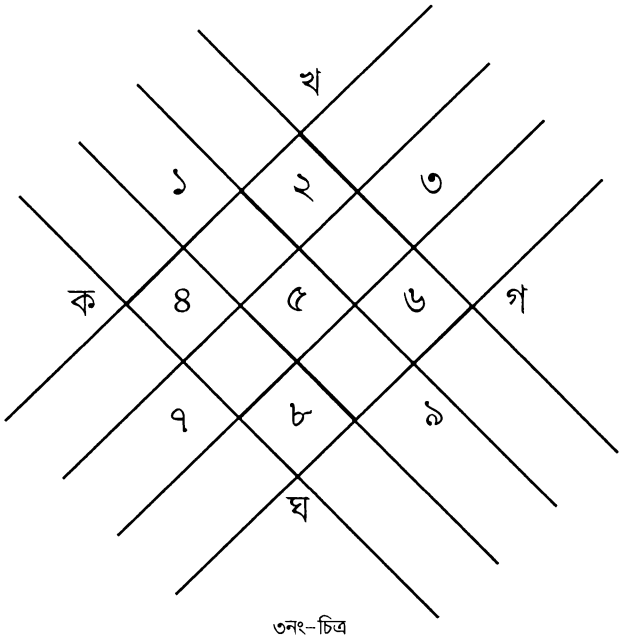

৩নং–চিত্র

কোনাকুনি রেখাগুলো টানাতে দেখ ক খ গ ঘ চিহ্নিত একটি চারকোনা ঘর হয়েছে আমাদের ১নং চিত্রের মতো। তোমাদের সুবিধার জন্য ৩নং চিত্রের ক খ গ ঘ ঘরটি

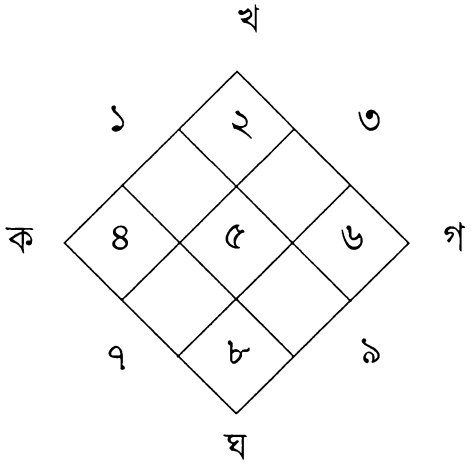

৪নং চিত্র

আবার ৪নং চিত্রে দেখানো হল।

৪নং চিত্রে দেখ, ঐ চৌকোনো ঘরে চারটি ছোট ফাঁকা ঘর রয়েছে, যেগুলোতে কোনো সংখ্যা নেই।

এবারে ৫নং চিত্রের মতো ঐ ফাঁকা ঘরগুলোতে উল্টোদিকের অঙ্কটি বসিয়ে দাও।

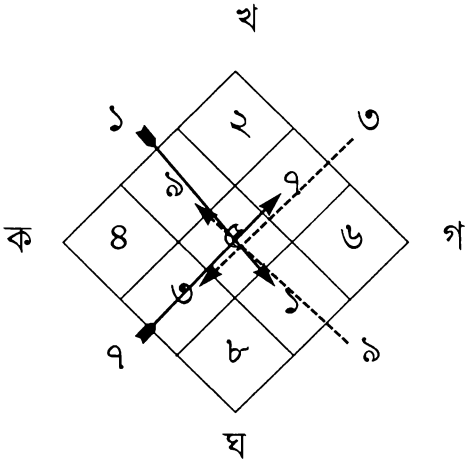

৫নং চিত্র

ঠিকঠাকমতো বসিয়ে নিলে ৬নং চিত্রের মতো তোমার ম্যাজিক স্কোয়ার তুমি পেয়ে যাবে।

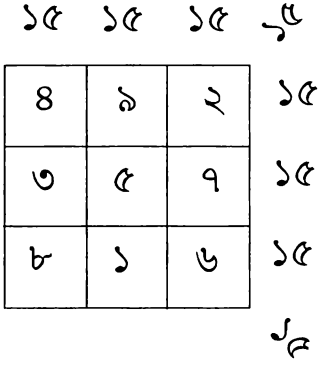

৬নং চিত্র।

পরপর যে কোনো ৯টি সংখ্যার জন্য তুমি এমন ম্যাজিক স্কোয়ারটা বানাতে পারবে। নিজে কয়েকবার চেষ্টা করে দেখ। তারপর, বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দাও।

ও হ্যাঁ। ধন্যবাদ দিতে চাও। সেটি বুমবুমকে দিও।

আমার মানুষেরা গান করে

অফিস থেকে ঘরে ফিরতেই বুমবুমের মুখোমুখি। 'কী মজা? কালকে আমরা যাচ্ছি দূরের রাস্তায়।' বুমবুম বলল।

শীতকালে ছুটির দিনগুলোতে বেড়ানোর মতলবটা করেছে আপা-দুলাভাই। বুমবুম আর আমিও সঙ্গী হচ্ছি। 'তা আমরা কোথায় যাচ্ছি!' জানতে চাইলাম।

'সরাসরি বলছি না?' বুমবুম সব সময় হেঁয়ালি করে কথা বলে। 'আমার মানুষের গান করে।'

'বুঝে গেছি।' আমি বললাম। 'ময়মনসিংহ।'

'তোমার তো অনেক বুদ্ধি।' বুমবুমের স্বীকারোক্তি।

'দূর। এটা তো আমরা ছোটবেলা থেকে জানি। My= আমার, Men= মানুষেরা, Sing= গান করা। Mymensingh তা হলে আমার মানুষেরা গান করে।' আমি বললাম।

'খালা-বোনঝি দেখছি সন্ধ্যা না হতেই হেঁয়ালির ঝাঁপি খুলে বসেছ।' কোন ফাঁকে দুলাভাইও ঘরে এসে পড়েছে, আমরা দুজন দেখতেই পাই নি।

'তা হলে ক্ষুদে পণ্ডিত তুমি বল তো মিথ্যা-তুমি-দশ-পিঁপড়াতে কী হয়।

'এটা আমি জানি, বাবা।' বুমবুম হাসছে।' 'Lie-u-ten-ant। লেফটেন্যান্ট। তাই না।'

আমি দেখলাম পিছিয়ে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।

বললাম—'তা হলে পিসি চল যাই-তে কী হবে? বাপ-বেটা বলুক।'

যাক, বুমবুমকে ফাঁদে ফেলা গেছে। ওর বাপ দেখি ছেলের দিকে চেয়ে আছে। 'চেষ্টা কর। এটা অনুবাদ করলে হবে না।' দুলাভাই ছেলেকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে।

'তা হলে?' বুমবুম চিন্তিত।

'আমি আর একটু আভাস দিই।' বললাম। 'বিদেশী যারা বাংলা জানে না, তারা বাংলা শব্দ কীভাবে লিখবে?'

'ইংরেজিতে বানান করে।' বলেই বুমবুম চিৎকার করে উঠল। তারপর কাগজে লিখে বলল 'পেরেছি। পিসি চল যাই-তে হবে সাইকোলোজি। Psychology। Psy-পিসি, Cholo-চল gy- যাই।

'বিলকুল ঠিক।' দুলাভাই খুশি। 'এবার যাও, গিয়ে মা'কে সাহায্য কর। খালামণিকে রেস্ট নিতে দাও।'

পরদিন সকাল সকাল আমরা রওনা হয়েছি ময়মনসিংহের উদ্দেশে।

আপা জানতে চাইল আমাদের সেখানে পৌঁছতে কত সময় লাগবে।

একটু হিসাব করে নিয়ে দুলাভাই বলল—যদি ৩০ কিলোমিটার গতিতে যাই তা হলে সকাল ১১টায় সেখানে পৌঁছব আর যদি ২০ কিলোমিটার গতিতে যাই, তা হলে সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর ১টা বাজবে।'

'অত আস্তে যাওয়ারও দরকার নেই, আবার বেশি তাড়াতাড়ি যাওয়ারও দরকার নেই।' আপা দুলাভাইকে বলল—'তুমি বরং যাতে আমরা ঠিক ১২টায় সেখানে পৌঁছতে পারি, সেভাবে গাড়ি চালাও।'

'আচ্ছা।' দুলাভাই পেছন ফিরে আমি আর বুমবুমের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল—'ঠিক ১২টায় পৌঁছাতে হলে কত গতিতে গাড়ি চালাতে হবে?'

আমি বললাম—'৩০ কিলোতে ১১টা আর ২০ কিলোতে গেলে ১টা। কাজেই ২৫ কিলোতে গেলে দুপুর ১২টায় পৌঁছানো যাবে।'

দুলাভাইয়ের চেহারা দেখে বুঝলাম আমার উত্তরটা তার পছন্দ হয় নি।

'হিসাবটা এত সোজা হলে বাবা আমাদের জিজ্ঞেস করত না।' বুমবুম। ফিচকে হাসি হাসছে। তারপর যে গতিটা বলল তাতে দেখলাম দুলাভাই সায় দিলেন।

বন্ধুরা, চেষ্টা করে দেখ তো, কত গতিতে গেলে আমরা ঠিক ১২টায় ময়মনসিংহ পৌঁছতে পারব?'

ভাগাভাগির দাবা খেলা

দাবা খেলা নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ কোনো কালেই ছিল না। এই বাসাতে এসে দেখেছি ফাঁক পেলে বুমবুম আর তার বাবা দুজনেই দাবা বোর্ড পেতে বসে যায়। আপা অবশ্য বাপ-বেটার এই আগ্রহ খুব একটা ভালো নজরে দেখে না। প্রায়শ আপার আক্রমণে বাপ-বেটার খেলা ভণ্ডুল হয়ে যায়।

আমি খেয়াল করেছি বুমবুম আর ওর বাপের জেতার হার প্রায় সমান। অর্থাৎ আজ যদি দুলাভাই জেতে, কাল তা হলে ঠিক ঠিক বুমবুম জিতে যায়। অর্থাৎ ওদের যে কারোরই জেতার সম্ভাবনা সমান-সমান।

সেদিন আপা গিয়েছে মার্কেটে। দুপুরে খেয়েদেয়ে বাপ আর বেটার জঙ্গ শুরু। আমি হয়েছি দর্শক। আমার পীড়াপীড়িতে আজ বাপ-বেটার লড়াই। যে প্রথম তিন গেম জিতবে সেই হবে এই বাসার চ্যাম্পিয়ন। আর পাবে পুরস্কার। পুরস্কার হবে নগদ অর্থে। এটা অবশ্য আমি দেব।

প্রথম গেমে দেখা গেল দুলাভাই কোনো সুযোগই পেল না। বুমবুম খুব সহজে জিতে গেল।

দ্বিতীয় গেমটা অনেকক্ষণ চলার পর বুমবুম রণে ভঙ্গ দিল। ফল ১-১।

তিন নম্বর গেমটা প্রথম থেকে টানটান উত্তেজনা।

আমি অবশ্য খেলা বুঝছি না। বাপ-বেটার চেহারা দেখছি। জয়ের দেবী শেষ পর্যন্ত বুমবুমের দিকেই হাসলেন। ফলাফল বুমবুম ২-দুলাভাই ১।

বিকেলে চা-নাশতার পর চার নম্বর গেম শুরু হয়েছে। আমি অবশ্য একটু আতঙ্কিত কারণ যে কোনো মুহূর্তে আপা এসে পড়তে পারে।

হলও তাই। বুমবুমের ঘোড়ার আক্রমণ সামাল দিতে দুলাভাই যখন ব্যস্ত তখনই তৃতীয় পক্ষের হামলা শুরু হল।

আপা মার্কেট থেকে ফিরে বাপ-বেটার দাবাখেলা দেখেই ক্ষেপে উঠলেন—'কী, আমাকে মার্কেটে পাঠিয়ে নিজেরা আনন্দ করছ?' বলতে না বলতেই আপার এক টানেই বোর্ড কুপোকাত। মন্ত্রীটন্ত্রী কই গেল। বুমবুম এক লাফে ওর বাবার পেছনে গিয়ে লুকোল।

'আহা। আপা তুমি কী করলে?' আমি বললাম। 'ওদের এটা চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই। পুরস্কারও আছে। নগদ টাকা। আমি দেব । তুমি সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

'দিয়েছি, দিয়েছি খুব ভালো করেছি।' আপার অনেক রাগ। 'দাবার বোর্ড আর ঘুটি আমি চুলায় দেব।' গজগজ করে আপা ভেতরে চলে গেলেন।

বোর্ড আর ঘুটি তুলে রাখল বুমবুম।

দুলাভাই হতাশ হয়ে বলল—'ভেবেছিলাম, শ্যালিকার দেওয়া পুরস্কারটা পাব, তাও আর জুটল না।'

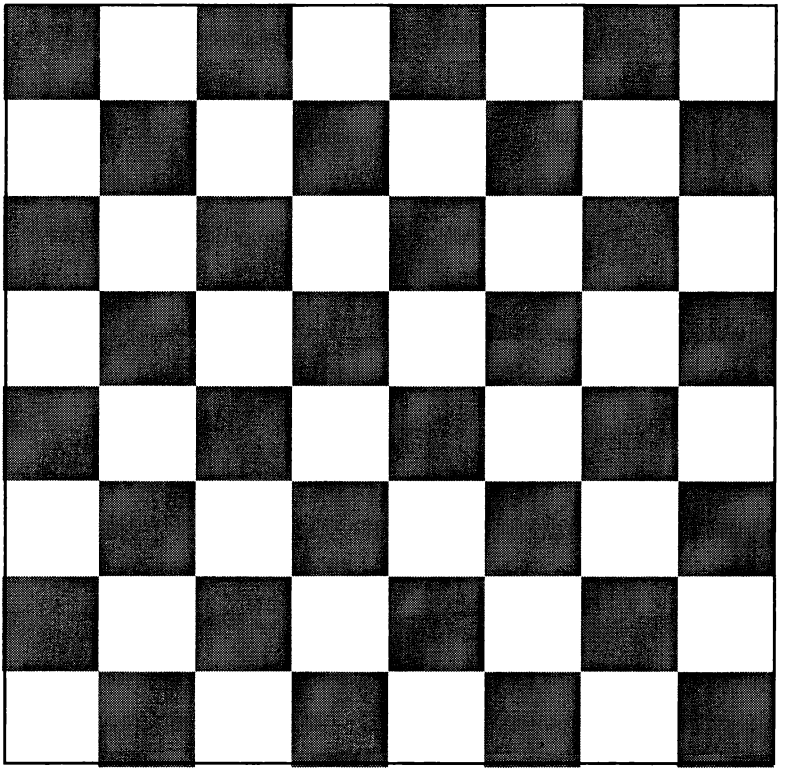

বললাম, টাকাটা দেব না তা তো বলি নি। কিন্তু যেহেতু প্রথম তিন গেম কেউ জেতে নি, তা হলে ফলাফলটা কী হবে। যেহেতু বুমবুম দুটোতে জিতেছে, তা হলে পুরস্কারের পুরোটা কী পাবে?

'না, তা কেন হবে।' দুলাভাই বলল—'কথা ছিল যে তিন গেম জিতবে সে হবে বিজয়ী। বুমবুম দুটো জিতেছে, তিনটে তো আর জেতে নি।'

'বুমবুম, তোর কী মত?' আমি বললাম।

'বাবা ঠিকই বলেছে, আমি তো আর তিন গেম জিতি নি।'

বুমবুম বলল, 'তবে সম্ভাবনা দেখে আমরা টাকাটা ভাগ করতে পারি। তাই না, বাবা?'

দুলাভাই সায় দিল।

বুমবুম বলল, 'আচ্ছা যদি চার নম্বর গেম বাবা জিতত এবং তারপর মা এসে পড়ত তা হলে কী হত।'

'তোমরা দুজনেই সমান সমান হতে। টাকাও অর্ধেক করে পেতে।' আমি বললাম।

'অর্থাৎ।' বুমবুম বলল। 'সেক্ষেত্রে অর্ধেক টাকা আমি অবশ্যই পেতাম। কাজেই, এখনো অর্ধেক টাকা আমি পাব। ঠিক না বাবা?'

দুলাভাই মাথা ঝাঁকাল।

'তা হলে প্রথমে অর্ধেক টাকা আমার।' বুমবুম বিচারকের ভঙ্গিতে বলল।

'বাকি অর্ধেক টাকা আমরা চার নম্বর গেমের, যেটা আসলে শেষ হয় নি তার সম্ভাবনা দেখে ভাগ করি। ঐ গেমে কার জেতার সম্ভাবনা ছিল। খালা—তুমিই বল?'

'এটা সোজা, তোদের বাপ-বেটার পারফরম্যান্স অনুসারে যে কেউ জিততে পারত।' আমি বললাম।

বুমবুম বলল, 'ঠিক। ফিফটি-ফিফটি। অর্থাৎ বাকি অর্ধেকের অর্ধেক আমার, অর্ধেক বাবার।'

ব্যাংকার হিসেবে আমার মত বললাম—'তা হলে মোট চার ভাগের তিন ভাগ পাবে বুমবুম আর এক ভাগ পাবে দুলাভাই। বুমবুমের হিসাব ঠিক আছে তো দুলাভাই।'

ছেলের জ্ঞানের বহরে বাপ সবসময় আপ্লুত থাকে। একটু হেসে বলল—'ওর হিসাব ঠিকই আছে। ভাবছি, কয়েক শ বছর আগে জন্মালে বুমবুমের হাতেই গণিতের সম্ভাবনা শাখাটির জন্ম হত। কারণ সম্ভাবনা তত্ত্বের জন্মের ঘটনাটি অনেকটা এরকম।'

তাড়াতাড়ি নিজের রুম থেকে টাকা নিয়ে আসলাম। টাকা হাতে রুমে ঢুকতে গিয়ে দেখি আপা।

'কিসের টাকা?'

'না, মানে। প্রাইজমানি'—আমি বললাম।

এক ঝাপটা মেরে আপা আমার কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে নিল।

'আমি মার্কেটে গিয়েছিলাম বলেই, তোমাদের এই খেলা। কাজেই, ভাগাভাগির কোনো কাজ নেই। প্রাইজমানির পুরোটাই আমার প্রাপ্য।'

এই বলে আপা টাকা নিয়ে গটগট করে নিজের ঘরে চলে গেল।

আমি, বুমবুম ও দুলাভাই নির্বাক হয়ে রইলাম।

তোমার আমার মতন ছিল মায়ের সাতটি ছেলে

স্কুলে পরীক্ষা শেষ। বুমবুম তাই বাড়িতেই থাকে। ওর বাবার সঙ্গে ওর খাতিরটা ভালো। সে জন্য আমি আর আপা বেঁচেবর্তে যাই। কদিন হল আমাদের বাসায় একজন মেহমান এসেছেন। বুমবুমের বিপি দাদু। দুলাভাইয়ের খালু। বিপি শুনে আমি ভেবেছিলাম তিনি ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামে চাকরি করেন। বুমবুম অবশ্য আমার ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছে। কারণ ওর দাদু অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সালাউদ্দিন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় বীরের খেতাব বীরপ্রতীক প্রাপ্ত। এই বীরপ্রতীকই সংক্ষেপে বিপি।

বুমবুম তার বিপি দাদুর সঙ্গে প্রতিদিন সকালে বের হয়ে পড়ে। রাতে অবশ্য জানা যায়, ওদের আগ্রহের বিষয়। সেদিন গেল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। একদিন নয় নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা জমায়েত হয়েছিল সেখানে গিয়েছে। কাল সারা দিন কাটিয়ে এসেছে বিজয় কেতন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। এরই মধ্যে দেখলাম ওর বাবা ওর জন্য কিনে এনেছে *বাংলাদেশ '৭১* শিরোনামের একটি মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার। এসব নিয়েই সে ব্যস্ত।

কাল বাসায় ফিরতেই ওর মুখোমুখি। ওর বিপি দাদু গিয়েছেন এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে। বেচারা তাই একা একা।

'আচ্ছা খালা। এক থেকে দশের মধ্যে যে কোনো একটা সংখ্যা বল তো?'

'সাত।' আমি বললাম।

'জানতাম তুমি সাতই বলবে।' বুমবুমের পাকামি, 'বেশিরভাগ লোকেই তাই বলে। আচ্ছা সাত বললে প্রথমেই তোমার কিসের কথা মনে হয়?'

'সাত সমুদ্র।' আমি বললাম, 'তারপর সপ্তম আশ্চর্য আরো এগোলে সাত ভাই চম্পা কিংবা তুষার কন্যার সাত বামন।'

'অথচ দেখ।' বুমবুম বলল, 'সাত বললেই আমার মনে হয় মায়ের সাত সন্তানের কথা। তোমার আমার মতোই তারা ছিল।'

'সে কী। আমার আবার সাত সন্তান কোথায়?' খালা–বোনপোর আলাপে কখন দেখি বুমবুমের মাও হাজির।

'না না। এই মা হচ্ছে সবার মা–জননী জন্মভূমি।' বুমবুম বলে উঠল, 'আমি বলছি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী সাত জন বীরশ্রেষ্ঠের কথা।'

'শাবাশ বুমবুম, শাবাশ।' দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছেন বুমবুমের বিপি দাদু, তার চোখে জল?

আমি খুব অবাক হয়েছি। ছোট্ট বুমবুম, স্বাধীনতার বেশ অনেক বছর পরে ওর জন্ম। কেমনে জানি ইতিহাসের অনেকটুকুই জেনে বসে আছে। 'তুমি কি এই সাত বীরযোদ্ধার নাম জান।' বিপি খালু জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ'। বলেই বুমবুম তড়তড়িয়ে বলে গেল। বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহি মোস্তাফা কামাল, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহি হামিদুর রহমান, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক

নূর মোহাম্মদ, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার রুহুল আমিন এবং বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান।

'বাহ বেশ।' ওর জ্ঞানের বহরে আমি খুবই খুশি! বিপি খালু বললেন, 'তুমি কি জান এদের দুজনের কবর রয়েছে ভারতে আর পাকিস্তানে?' বুমবুমের চোখ দেখে বোঝা গেল এ তথ্য সে জানে না।

বিপি খালু এ তথ্য সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন। বন্ধুরা নিজেরা চেষ্টা কর। না পারলে এ বইয়ের শেষ থেকে জেনে নাও।

রাতের বেলায় আমরা সবাই বসে শুনছিলাম যুদ্ধের গল্প। বিপি খালু বলছিলেন তার অভিজ্ঞতার কথা। একটা ছোট্ট দল নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দেবেন। নিজেরা তিনটে ছোট দলে ভাগ হয়ে ঢুকছেন। রাত হয়েছে। সীমান্ত পাড়ি দিয়ে গ্রামে ঢুকতেই একটি বাড়ির মতো। দেখা গেল বাড়িতে এক বুড়ি মা। তিন ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন।

'প্রথম দল নিয়ে আমি বুড়ির বাড়িতে উঠলাম।' বীর মুক্তিযোদ্ধা বলছেন। 'জানতে চাইলাম খাবারদাবার কিছু হবে কি না? ওই মহীয়সী নারী বললেন বাড়িতে যে কয়টা ডিম আছে তার অর্ধেক এবং একটা ডিমের অর্ধেক তোমাদের দেব। সেভাবে আমাদের তিনি খাওয়ালেন। আশ্চর্য হলাম তার একটা ডিমকে অর্ধেক করতে হল না দেখে। পরে বিকেলে তিন দল একসঙ্গে হলে জানতে চাইলাম বাকিদের খবর। দেখা গেল ওই বৃদ্ধ মহিলা দুই দলকে যত ডিম তার অর্ধেক ও একটা ডিমের অর্ধেক খাইয়েছেন। তিন নম্বর দল আসার পর তার বাসায় আর একটা ডিমও ছিল না। আর কী আশ্চর্য, আমরা প্রত্যেকেই একটা করে ডিম খেয়েছি?'

'তোমরা ওই দলে মোট কত জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলে?' বুমবুম জানতে চাইল।

দাদু কিছু বলার আগেই বুমবুমের বাবা বললেন, 'সে সংখ্যাটা বরং বুমবুম নিজেই বের করুক।'

'এ খুবই সোজা।' বুমবুম বলল। বলেই যে সংখ্যাটা বলল তাতে বিপি খালু ঘাড় নাড়লেন। আমি ভাবছি বন্ধুরা এ সংখ্যাটা বের করতে পার কিনা?

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে দেখলাম বুমবুম গুনগুন করে গান গাইছে—

তোমার আমার মতন ছিল
মায়ের সাতটি সন্তান
ভুলি নাই, তোমাদের মতো আরো সহস্র
ভুলি নাই।

মুক্তির মন্দির সোপান তলে

এইবাড়িতে বিজয় দিবসে খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার রেওয়াজ। রাতেই বুমবুম আমাকে জানিয়ে রেখেছিল। তাই সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে করে সবার সঙ্গে আমরাও সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে চলে এসেছি।

স্মৃতিসৌধ আমাদের সবার পরিচিত। অন্তত একাধিক টাকার নোটে স্মৃতিসৌধের ছবি আছে। প্রতিদিন বাংলাদেশ টেলিভিশনে খবরের আগে স্মৃতিসৌধের ছবি দেখানো হয়।

স্মৃতিসৌধে দুলাভাই বলছিলেন বিভিন্ন তথ্য।

স্বাধীনতা যুদ্ধের তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই স্মৃতিসৌধ। স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস ছাড়াও বিদেশী রাষ্ট্রীয় অতিথিরা আসলে এই স্মৃতিসৌধে নিজেদের শ্রদ্ধা জানিয়ে যান। কখনো কখনো তাঁরা স্মৃতিসৌধের বাগানে একটি গাছের চারাও রোপণ করেন।

এই পর্যায়ে বুমবুম বলে উঠল—'কিন্তু ২০০০ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এসেছিলেন। তিনি তো বাবা এখানে আসেন নি?'

'হ্যাঁ। আসেন নি। হয়তো কোনো সমস্যা ছিল।' দুলাভাই বলল।

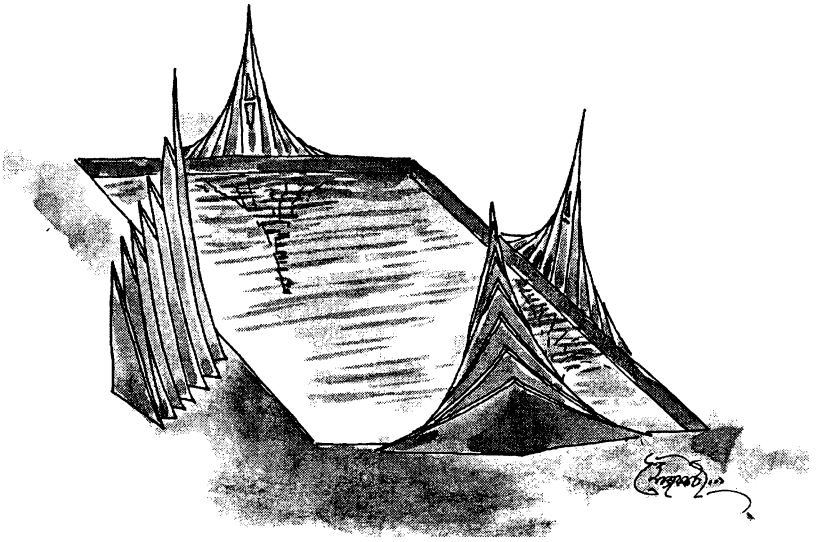

'সমস্যা না, কচু।' আপা গজগজ করে বলে উঠল।' আসলে আমেরিকা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ সমর্থন করে নি। পাকিস্তানি হানাদারদের পক্ষে ছিল। তাই স্মৃতিসৌধে আসেন নি বিল ক্লিনটন।'

'তাই তো। ৭১ সালে ওরাই তো বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল।' আমি যোগ করলাম।

'এসব এখন তাক।' দুলাভাই বাধা দিলেন। 'ঐ দেখ মূল বেদি। ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে। ওখানে আমরাও আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবো।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যদের সঙ্গে আমরাও মূলবেদিতে গেলাম। খেয়াল করে দেখলাম বুমবুম নিজে ওর টব থেকে দুটো গোলাপ ফুল নিয়ে এসেছে। ঐ টবের ফুল ও কাউকেই ধরতে দেয় না।

ফেরার পথে দুলাভাই বেশ একটা মজার গল্প শোনাল। সেটিই তোমাদের বলছি।

রূপকথার এক দেশের জনগণ আমাদের মতো যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে। যুদ্ধে যারা আত্মাহুতি দিয়েছে তাদের জন্য তারা বানাতে চায় স্মৃতিসৌধ। ঐ দেশে আবার চারটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে। প্রত্যেকে বলল–প্রত্যেক জাতির জন্য আলাদা আলাদা স্মৃতিসৌধ বানাতে হবে। যেই কথা সেই কাজ। প্রথমে বানানো হল চারকোনা একটি লেক। তার চারদিকে চারটি স্মৃতিসৌধ।

প্রত্যেক স্মৃতিসৌধ থেকে লেকে একটি সিঁড়ি নেমেছে। বানানো হয়ে যাবার পর রাজা মশাই উদ্বোধন করলেন স্মৃতিসৌধের। উদ্বোধনের জন্য তিনি নিজের বাগানের কিছু ফুল নিয়ে এসেছেন। ভাবলেন, ফুলগুলো ধুয়ে নিয়ে তারপর স্মৃতিসৌধে দেবেন। ওমা রাজা যেই লেকের পানিতে ফুল ছোঁয়ালেন ওমনি সব ফুল দ্বিগুণ হয়ে গেল। রাজা দেখলেন বেশ ভালো। তিনি প্রথম স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে আবার লেকের পানিতে ছোঁয়ালেন। ওমনি আবার দ্বিগুণ। এভাবে সব স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে রাজামশাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ করলেন।

ঐ দেশের রাজকুমারী ছিল খুব খেয়ালি। দ্বিগুণ হওয়ার পুরো ব্যাপারটা খেয়াল করে রাজকুমারী ঘোষণা করল—এখন থেকে স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে হলে অবশ্যই তা লেকের পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। প্রতিবার ফুল দেওয়ার আগে অবশ্যই পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। আর সব স্মৃতিসৌধে সমানসংখ্যক ফুল দিতে হবে।

সেই থেকে ঐ দেশে ঐ নিয়মই বহাল।

দেখা যায়, সবাই অনেক ফুল নিয়ে যায়, নিয়মমতো ফুল দেওয়ার পর হাতে কিছু ফুল থেকেও যায়। তারপর একদিন ঐ দেশে হাজির হল আমাদের বুমবুম। নিয়ম জেনে, বুমবুম বাগান থেকে নিয়ে এল ফুল। তারপর শুরু করল তার ফুল দেওয়া। পানিতে ছোঁয়ায়, দ্বিগুণ হয়, স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে, আবার পানিতে ছোঁয়ায়, আবার দ্বিগুণ হওয়া—এভাবে চার নম্বর স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে বুমবুম যখন বের হল দেখা গেল ওর হাতে কোনো ফুল নেই। সব ফুলই ও স্মৃতিসৌধে রেখে এসেছে।

বন্ধুরা, তোমরা বলতে পার, শুরুতে বুমবুমের কাছে কয়টা ফুল ছিল?

ধাঁধার দেশে বুমবুম

কদিন ধরে আমার মন ভালো নেই।

আমার বদলির আদেশ হয়েছে। বুমবুমদের বাসায় আমার সোয়া দুই বছরের মেয়াদ ফুরোল। কেমন করে দুই-দুইটা বছর কেটে গেল। বুমবুমেরও মন খারাপ। বলছে আমার কথা ওর খুব মনে পড়বে।

সবকিছু গুছিয়ে নিচ্ছি। বাবা-মা'র কাছেই ফিরে যাচ্ছি। তবুও বুমবুম ও তোমাদের ফেলে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

খুব বেশি মন খারাপ করে ফেলেছি কি না জানি না। সেই জন্য হয়তো কাল রাতে এক মজার স্বপ্ন দেখেছি। আমি আর বুমবুম হাজির হয়েছি এক মজার দেশে। তোমাদের পুরো গল্পটা শুনিয়ে যাই।

আমি আর বুমবুম দাঁড়িয়ে আছি এক বিরাট সিংহদরজার সামনে। ঐ দরজার সামনে আমরা কেমন করে হাজির হয়েছি জানি না। দেখি কী, দরজার সামনে পাহারাদার দুটো সিংহ। আমি বেশ ভয় পেয়েছি।

'খালামণি। একটা সিংহ আর একটা সিংহী।' বুমবুম আমাকে জানাল।

'বুঝলি কেমনে একটা সিংহী।'

'ওমা। একটার কেশর আছে। আর একটার নেই যে!'

আমিও দেখলাম।

সিংহ আমাদের দেখে এগিয়ে আসল। তারপরই মানুষের গলায় বলে উঠল—'ভেতরে যেতে চাও?'

আমি তো অবাক। সিংহ দেখি মানুষের মতো করে কথা বলে। বললাম—তা তো বটেই।

'বেশ।' সিংহীটা এসে আমাদের হাতে কাগজ-কলম দিয়ে বলল—'চটপট লেখ। এগার হাজার এগার শ এগার।'

সোজা কিনা। আমি ঝটপট লিখলাম ১১১১১১।

আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে বুমবুম পুরো সংখ্যাটা কেটে দিয়ে লিখল—১২১১১।

সিংহকে কাগজটা দেখাতে বলল—'হয়েছে। এবার যাও।' বড় দরজাটা খুলে গেল। আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম। পেছনে দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সুন্দর একটি বাগান। অনেক গাছপালা। দূরে পাহাড়ও দেখা যাচ্ছে।

একটু এগিয়ে বুমবুমকে বললাম—আমার লেখা সংখ্যাটা কেটে দিলি কেন?

'তোমারটা হয় নি তো। তুমি লিখেছ এক লক্ষ এগার হাজার এক শ এগার। সিংহী লিখতে বলেছিল, এগার হাজার এগার শ এগার। তুমি যদি কথায় লিখতে তা হলে এই ভুল হত না। অঙ্কে লিখলে ১১০০০+১১০০ + ১১=১২১১১ লিখতে হবে। আমি তাই লিখেছি।'

হাঁটতে হাঁটতে একটু এগোতে হঠাৎ শুনি 'হালুম।'

ওরে বাবারে। এ দেখি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। মুখে একটা ঝুড়ি।

বুমবুম ভয়ে আমাকে জাপটে ধরে রেখেছে। আমার অবস্থাটা বুঝে নাও।

আমাদের অবস্থা দেখে বাঘটা ঝুড়িটা মুখ থেকে নামিয়ে সে কী হাসি! একেবারে গড়াগড়ি দিয়ে হাসছে। তারপর সামনে এসে মানুষের গলায় বলল—'ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছি। আর রাজবাড়ি পর্যন্ত তোমাদের এগিয়ে দেব।'

বাঘের কথা শুনে আমি ঝুড়িটার দিকে তাকালাম। অনেক ফল খেয়েদেয়ে আমরা এগোলাম।

'এটা কিসের বাগান।' বুমবুম বলল।

'সুপারি বাগান।' গাছ দেখে বললাম।

'হ্যাঁ। গুবাক তরু। আমাদের রাজকুমারীর ছোট্ট বাগান।' সবজান্তা রয়েল বেঙ্গল টাইগার বলল। 'এখানে ছয়টি লাইনে গাছ লাগানো হয়েছে। প্রত্যেক লাইনে চারটা করে গাছ।'

'অর্থাৎ মোট ২৪টি গাছ।' আমি বললাম।

'না, অত গাছ নেই।' সঙ্গী বাঘ বলল।

'তা হলে নিশ্চয়ই ১২টা।' বুমবুম বলল।

'হ্যাঁ। ১২টাই আছে।'

আমি অবাকই হলাম। প্রতি লাইনে ৪টা করে ৬ লাইনে মোট ১২টা গাছ কেমন করে হয়।

আমার অবস্থা বুঝে বুমবুম মাটিতে নিচের মতো করে একটা নকশা আঁকল।

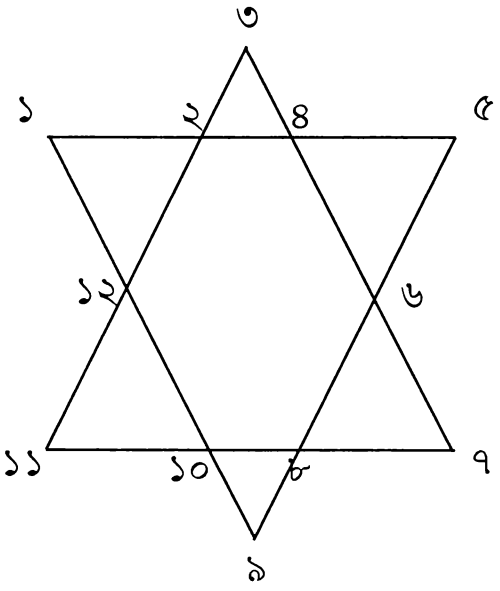

তাতেই আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। সেইসঙ্গে বুঝলাম রাজকুমারীর অনেক বুদ্ধি।

হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বেশ তৃষ্ণা পেয়ে গেল। বাঘকে বলতে বলল সামনে একটা নদী আছে। স্বচ্ছ পানি। খাওয়া খাবে।

নদীর দিকেই গেলাম।

আমাদের দেখেই অনেকগুলো হাঁস উড়াল দিয়ে উঠে পড়ল।

পানি খেতে গিয়ে দেখলাম নদীতে একটা বক, একপায়ে ধ্যান করছে।

বাঘ-সিংহের কাণ্ড দেখে ততক্ষণে আমার আর ভয়ডর নেই। বককে বললাম—অনেক পাখি যে উড়ে গেল, ওরা কোথায় গেল?

'রাজবাড়িতে।' বলল, 'রাজকুমারীর বিয়েতে সবারই নিমন্ত্রণ।'

'ওরা কতটি ছিল?' সঙ্গের বাঘটি জানতে চাইল।

'তা ওরা যতটি গেল, পরের ঝাঁকে ততটি আসবে। এর পরে আসবে অর্ধেক, তার পরে তারও অর্ধেক।'

'তা হলে মোট কত হল?' আমি জানতে চাইলাম।

'তা কত? আমাকে সহ যদি ধর তা হলে মোট ১০০ হবে।' বকটি বলল।

'বুঝেছি।' বুমবুম বলল। 'চল যাই।'

'বুঝেছিস মানে?' আমি বললাম। 'কত পাখি উড়াল দিয়েছে?'

'৩৬টি।' বুমবুম হাঁটতে হাঁটতে বলল।

নদীর পার দিয়ে হেঁটে আমরা একটা সেতুর সামনে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম অনেকগুলো নেকড়ে সেখানে জটলা পাকিয়ে আছে।

সঙ্গী বাঘ এগিয়ে যেতে কয়েকটি নেকড়ে এসে বলল—মালবোঝাই একটা ট্রাকের উপরের অংশ সেতুর উপরের রেলিঙে আটকে গেছে। এখন যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

বাঘসহ আমরা অকুস্থলে এসে দেখি একটা ট্রাকের উপর মালের সামান্য অংশ সেতুর উপরের রেলিঙের সঙ্গে আটকে গেছে। সব দেখে বুমবুম বলল—'ট্রাকের চার

চাকার হাওয়া একটু করে ছেড়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

কথামতো তাই করাতে ট্রাকটি নির্বিঘ্নে চলে গেল। সেতু পার হয়ে আমরা একটা জঙ্গলমতো জায়গায় এসে পড়লাম।

হঠাৎ–ই কোত্থেকে উদয় হল একটা শেয়াল। তার মুখে একটা কুমিরছানা, জীবন্ত। শেয়ালের মুখ থেকে বের হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

শেয়ালের পেছন পেছন একটা কুমিরও হাজির।

কুমিরছানার অসহায় অবস্থা দেখে আমাদের খুব করুণা হল।

বুমবুম শেয়ালকে বলল–'কুমিরছানাকে না খেয়ে তুমি ছেড়ে দিতে পার না?'

শেয়াল একটু ভেবে বলল, 'ঠিক আছে। আগে তুমি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। যদি তোমার প্রশ্নের উত্তর সঠিক হয় তা হলে আমি কুমিরছানাকে ছেড়ে দেব। আর যদি উত্তর ভুল হয়, তা হলে কুমিরছানাকে খেয়ে ফেলব?'

'প্রশ্নটা কী?' আমি জানতে চাইলাম।

'আমি কুমিরছানাকে খাব না ছেড়ে দেব?' ধূর্ত শেয়াল হাসতে হাসতে বলল।

'তুমি কুমির ছানাকে খাবে।' বুমবুম দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

'হা হা।' শেয়াল মহাখুশি। 'সিদ্ধান্তটা তুমিই দিলে। এখন যদি আমি কুমিরছানাকে ছেড়ে দেই, তা হলে তোমার উত্তর হবে ভুল। সেক্ষেত্রে শর্ত অনুসারে আমি কুমির ছানাকে খাব। কাজেই সব শেষ।'

'দাঁড়াও।' বুমবুম বলল, 'তুমি যদি কুমিরছানাকে খাও তা হলে তোমার প্রশ্নের আমি সঠিক জবাব দিয়েছি। সেক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই কুমিরছানাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য। কারণ এটাই শর্ত ছিল। বাঘ মশাই কী বলেন?'

আমিও দেখলাম বেচারা শেয়াল পড়েছে ভালো রকমের ফাদে। কোনোভাবেই সে এখন আর কুমিরছানা খেতে পারে না। বুমবুম যদি বলত শেয়াল কুমিরছানাকে ছেড়ে দেবে তা হলেই বরং শেয়াল কুমিরছানাকে খেতে পারত।

শেয়াল সব বুঝতে পেরে কুমিরছানাকে ছেড়ে দিল। মা কুমির ও ছানা কুমির দুটোতে বুমবুমকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

জঙ্গলমতো জায়গাটা পার হয়ে আমরা একটা খোলা মাঠের সামনে পড়লাম। মাঠের শেষভাগে রাজবাড়ি। কোনাকুনি করে হেঁটে আমরা একেবারে রাজবাড়ির সামনে চলে এসেছি।

রাজবাড়ির সামনে বেশ কটি উচু মিনার। কয়েকটি হাতি শুঁড় দিয়ে পানি ছিটিয়ে সেগুলোকে ধোয়ার কাজ সারছে। রাজকুমারীর বিয়ে বলে কথা।

বুমবুমকে বললাম। 'মিনারগুলো বেশ উঁচু, তাই না।'

'কত আর উচুঁ। দেখি ওগুলোর উচ্চতা বের করা যায় কিনা।' এই বলে বুমবুম একটা লাঠি নিয়ে মিনারের দিকে এগোল। তারপর লাঠি দিয়ে মেপে ফেলল মিনারের ছায়া।

এরপর লাঠিটা নিয়ে মিনারের ছায়া বরাবর এগিয়ে আসল। লাঠিটা এমনভাবে ধরল যাতে লাঠির ছায়ার শেষবিন্দু আর মিনারের ছায়ার শেষবিন্দু একই হয়। তারপর,

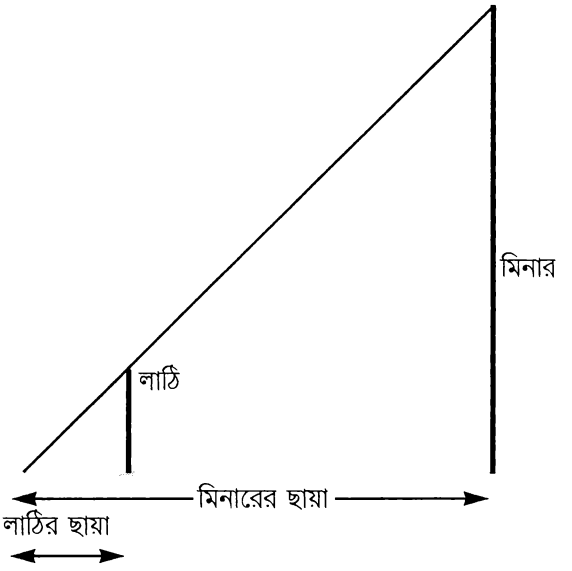

লাঠির ছায়ায় দৈর্ঘ্য মেপে ফিরে আসল আমাদের কাছে।

আমার প্রশ্ন দেখে ও বোঝাল জ্যামিতির হিসেবে—

$$\text{মিনারের উচ্চতা} = \frac{\text{মিনারের ছায়ার দৈর্ঘ্য}}{\text{লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য}} \times \text{লাঠির দৈর্ঘ্য।}$$

কাজেই মিনারগুলো ৪৫ ফুট উঁচু।

রয়েল বেঙ্গলের সায় দেখে বুঝলাম বুমবুমের হিসাব ঠিকই আছে। মিনার পার হয়ে রাজবাড়ি।

রাজবাড়িটা দোতলা বাড়ির মতো। বড় একটা সিঁড়ি রয়েছে।

সঙ্গী বাঘ এখনো আছে। বলল—এই সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে। যদি একলাফে ৩ ধাপ পেরোতে পার তা হলে শেষ লাফের জন্য থাকবে ১টি ধাপ।

'যদি ৪টা বা ৫টা করে একবারে পেরোতে পারি।' বুমবুম বলল।

'৪টা করে লাফালে শেষবারের জন্য থাকবে ৩টা আর ৫টা করে লাফালে থাকবে ৪টা।' রয়েল বেঙ্গলের জবাব।

'তা হলে এখানে মোট সিঁড়ির ধাপ ১৯টি। তাই তো?' এই বলে বুমবুম লাফিয়ে উঠতে শুরু করল।

বুমবুমের পেছন পেছন আমিও লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়েই একেবারে রাজদরবারে হাজির হয়েছি—

আমরা রাজদরবারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে আলো ঝলমল করে উঠল। বেজে উঠল অনেকগুলো যন্ত্র–ঢোল, কাঁসর, বাঁশি। প্রচুর হইহট্টগোলের মধ্যে শুনতে পেলাম

সবাই বলছে—'নতুন যুবরাজকে স্বাগতম। যুবরাজ দীর্ঘজীবী হোক।'

ভ্যাবাচেকা খেয়ে পাশে তাকাতে বাঘকে আর দেখলাম না। আমার পাশে একজন বৃদ্ধ—সৌম্যদর্শন। হেসে বলল—'আমি বাঘ সেজে এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। আমি এই দেশের মহামন্ত্রী। রাজকুমারীর শখ রাজ্যের সিংহদরজা থেকে এই পর্যন্ত সবগুলো ধাঁধার সঠিক জবাব দিয়ে যে ব্যক্তি রাজবাড়িতে আসতে পারবে তাকেই রাজকুমারী বিয়ে করবে। আজ আপনার ভাগ্নে সবগুলো ধাঁধার সমাধান করে রাজবাড়িতে পৌঁছেছে। কাজেই...।'

খুশিতে বুমবুমের দিকে তাকাতেই...

'খালামণি। সকাল হয়ে গেছে। তোমার ট্রেনের সময় হয়ে গেল। উঠে পড়।' বুমবুমের চিৎকারে আমার সাধের স্বপ্নটা ভেঙেই গেল। আহা আর একটু ঘুমোতে পারলে শেষটুকু জানা যেত, শেষ পর্যন্ত কেমন রাজকুমারী পেল বুমবুম।

বুমবুম, দুলাভাই, আপাকে রেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম আমার স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা হতে পারে।

আমার বুদ্ধিতে মনে হচ্ছে ধীর-স্থির হয়ে চোখকান খোলা রাখলে কোনো ধাঁধাই বুদ্ধিমানদের আটকে রাখতে পারে না।

বুমবুমের মতো বন্ধুরা, তোমরাও জীবনের হেঁয়ালিগুলো সঠিকভাবে সমাধান করতে পারবে, আশা করি।

ধাঁধার জবাব

লাল সবুজের পালা

আমি দেখেছি দুটো টুপি। ওই দুটো যদি **লাল** আর **লাল** হত তা হলে আমার মাথার টুপিটা হত **সবুজ** (কারণ লাল টুপি মাত্র দুটো)। কাজেই আমি যে লাল-লাল দেখি নি তা বুঝেছে বুমবুম ও তার মা। আমি হয় লাল-সবুজ অথবা সবুজ-লাল কিংবা সবুজ-সবুজ দেখেছি। বুমবুমের মা দেখেছে শুধু বুমবুমেরটা। এটা হয় লাল নয়তো সবুজ। যদি লাল দেখত তা হলে বুমবুমের মা বলত তার নিজেরটা সবুজ রঙের (কারণ, আমি দেখেছি লাল-সবুজ/সবুজ-লাল/সবুজ-সবুজ)।

আপা যেহেতু লাল রঙের টুপি দেখে নি, তাই তিনি নিজেরটা সম্পর্কে বলতে পারল না। আর, বুমবুম আমার আর ওর মায়ের জবাবটা শুনেছে। তাতে সে বুঝেছে আমি যেমন লাল-লাল দেখি নি তেমনি ওর মাও লাল রঙের টুপি দেখে নি। এই থেকে ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওর মাথার টুপিটার রং সবুজ। এজন্য কারো টুপি না দেখেই ও নিজের টুপির সবুজ রং সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছে।

বুমবুমের বুদ্ধি চমৎকার, এক লাঠিতে নদী পার

ছবিতে দুটো ত্রিভুজ হবে, যদি আমরা **ঙখচ** আর **চক** রেখাগুলোকে যোগ দেই। সে ক্ষেত্রে **কচখ** ও **খঙগ** ত্রিভুজ দুটোর মধ্যে <কখচ = <ঙখগ (বিপ্রতীপ কোণ), <খ ক চ = <ঙ গ খ (সমকোণ) আর কখ বাহু = খগ বাহু (উভয়ে ৩০ লাঠি)। কাজেই ত্রিভুজ দুটো সর্বসম হল। তা হলে **কচ** বাহু = **ঙগ** বাহু। আর এই ঙ গ বাহু মেপে নিয়ে ৪৮ 'লাঠি' পেয়েছিল বুমবুম। সেটাই ওই নদীর প্রস্থ।

রসগোল্লা, নয় শুধু গোল্লা

ঐ হাঁড়িতে মোট রসগোল্লা ছিল ২৭টি। বুমবুমের বাবা প্রথমে ৯টি খেয়েছিল। পরে, বুমবুমের কালাম কাকা এসে খেয়েছিল ৬টি (২৭-৯⇒১৮÷৩)। আর সেলিম কাকার ভাগে পড়েছিল ৪টি (১৮-৬⇒১২÷৩)। আর তা হলে শেষে ছিল (২৭-৯-৬-৪=) ৮টি। যেহেতু, মোট ২৭টি রসগোল্লা তাই সমান ভাগে প্রত্যেকের পড়ছে ৯টি করে। এর মধ্যে সেলিম কাকা আগে পেয়েছিল ৪টি, এখন পাবে ৫টি (৯-৪), আর কালাম

কাকা ৬টি তো খেয়েছে, তা হলে সে পেল ৩ টি (৯–৬)। আর বুমবুমের বাবা প্রথমেই ৯টি খেয়ে নিয়েছিল। কাজেই, তিনি আর শেষের ভাগ পান নি। যেহেতু তাঁর সামনে বাকি দুজন রসগোল্লার রস আহরণ করেছে, আর তাকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে, সেজন্যই তার এই দুঃখ।

তাক ধিনা ধিন ধিনাক দিন, জন্ম সাল-মাস জেনে নিন

এই ধরনের হিসাবের মূল ট্রিকস হল প্রথম সংখ্যাটিকে ১০০ দিয়ে গুণ করা, তাতে সংখ্যাটির পাশে দুটো শূন্য বসে এবং এর সঙ্গে শেষ সংখ্যাটা যোগ দিলে এটি একক ও দশকের ঘরে বসবে। অর্থাৎ ৭২ কে ১০০ দিয়ে গুণ করে ১১ যোগ করলে হবে ৭২১১। যাকে বলা হবে সে যেন সহজে ব্যাপারটা ধরতে না পারে সেজন্য এর মধ্যে একটা জানা সংখ্যা ঢুকিয়ে দিতে হবে। শেষে যোগফল থেকে ঐ সংখ্যাটা বাদ দিতে হবে।

প্রথমে ২০ ও পরে ৫ দিয়ে গুণ করার অর্থ আসলে ১০০ দিয়ে গুণ করা। আমি তাই করেছি। এর সঙ্গে যোগ করেছি ৬৯ × ৫ =৩৪৫। এইটুকু বুমবুমের অবদান। শেষ যোগফল ৭৫৫৬ থেকে এই ৩৪৫ বাদ দিয়ে বুমবুম ৭২১১ পেয়েছে যার ৭২ আমার জন্ম সন, ১১ জন্ম মাস।

পুরোটা দেখ

৭২ × ২০ ⇒ ১৪৪০ + ৬৯ ⇒ ১৫০৯ × ৫ ⇒ ৭৫৪৫ + ১১ ⇒ ৭৫৫৬।

এটিকে এভাবেও দেখা যায়,

৭২×২০ ⇒ (৭২×২০ + ৬৯) × ৫
⇒ ৭২ × ২০ ×৫ + ৬৯ ×৫
⇒ ৭২ × ১০০ + ৬৯ × ৫
⇒ (৭২০০ + ৩৪৫) + ১১
= (৭২০০ +১১) + ৩৪৫
= ৭২১১ + ৩৪৫ = ৭৫৫৬।

এই ট্রিকসটা একইজনকে একাধিকবার দেখাতে হলে ৬৯ কে কখনো ৭৩ কখনো ৫৭ এভাবে বদলে দিতে হবে। সেইক্ষেত্রে শেষ যোগফল থেকে যে সংখ্যাটা বাদ দিতে হবে তার হিসাবটা মনোযোগ দিয়েই করতে হবে।

বুমবুমে রাখ আস্থা, বিপদেও পাবে রাস্তা

যদি দুজনকেই জুঁইয়ের রাস্তা দেখাতে বলা হয় তা হলে সত্যবাদী ভাই আসল রাস্তাটা দেখালেও মিথ্যাবাদী দেখাবে উলটো। এখন যদি মিথ্যাবাদীকে জিজ্ঞেস করা হয় সত্যবাদী কোন রাস্তাটা দেখাবে, তা হলে সে মিথ্যা বলার জন্য আসল রাস্তা (যেটা সত্যবাদী বলত) তার উলটোটা দেখাবে। আবার সত্যবাদীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় মিথ্যেবাদী কোন রাস্তাটা দেখাত, সেক্ষেত্রে সত্যবাদী সত্যের খাতিরে উলটোটা (যেহেতু মিথ্যেবাদী এটাই দেখাত) দেখাবে। কাজেই উভয়ক্ষেত্রে দেখানো রাস্তার উলটোদিকেই আসল রাস্তা থাকবে।

ছুটির দিনে মামার বাড়ি

রহিম মিয়া ৬০টি পাকা আম প্রতি জোড়া ৫ টাকা হিসেবে ১৫০ টাকায় এবং ৬০টি কাঁচাপাকা আম ৩টি ৫ টাকা হিসাবে ১০০ টাকায় অর্থাৎ মোট ২৫০ টাকায় বিক্রি করত। বুমবুমের বাবা বিক্রি করেছে দুই ধরনের আম একত্রে মিশিয়ে। যদি প্রতি ৩টা কাঁচাপাকা আমের সঙ্গে ২টি পাকা আম মেশানোর পর ৫টি আম ১০ টাকা করে বিক্রি করা হত তা হলে হিসাব ঠিক থাকত। কিন্তু কাঁচাপাকা ও পাকা আম ছিল সমান সমান (৬০টি করে)। অর্থাৎ প্রতি ৫টি আমে ২টি পাকা ও ৩টি কাঁচাপাকা এই অনুপাত শেষের দিকে বজায় থাকে নি। শেষের দিকে শুধু পাকা আম ছিল এবং সেটি প্রতিদিনকার থেকে কম দামে বিক্রি করতে হয়েছে। এ জন্য ১২০টি আম প্রতি ৫টি ১০ টাকা হিসাবে বিক্রি করাতে বুমবুমের বাবা ২৪০ টাকা পেয়েছিল।

গুণ ভাগের রকমফের

৩ অঙ্কের কোনো সংখ্যার ডান পাশে ঐ সংখ্যাটি আবার লেখার অর্থ হল সংখ্যাটিকে ১০০১ দিয়ে গুণ করা। আমি প্রথমে তাই করেছি। তারপর ঐ সংখ্যাকে ১১, ১৩ আর ৭ দিয়ে পরপর ভাগ করার অর্থ আবার ১০০১ দিয়েই ভাগ করা। কারণ—১১ × ১৩ × ৭ =১০০১। তা হলে, প্রথমে যে সংখ্যাটা দিয়ে শুরু হয়, শেষেও তাই থাকবে। কারণ ১০০১ দিয়ে প্রথমে গুণ, তারপর ১০০১ দিয়ে ভাগ করলে ঐ সংখ্যাটাই পাওয়া যাবে। আমি বুমবুমকে যে কাগজটা দিয়েছিলাম তাতে ১৩৯ই লেখা ছিল। তা দেখে বুমবুম সঠিক জবাব দিয়েছে।

পুরো ধাপগুলো দেখ

১৩৯ ⇒ ১৩৯১৩৯ ÷১১ = ১২৬৪৯
১২৬৪৯ ÷ ১৩ = ৯৭৩
৯৭৩ ÷ ৭ = ১৩৯।

বুমবুম দি ম্যাজিশিয়ান

তিনটে জিনিস তিন জনের মধ্যে বিভিন্নভাবে দিতে চাইলে মোট ছয় ভাবে তা সম্ভব। আপা, দুলাভাই ও আমার মধ্যে কলম, ঘড়ি ও মোবাইল নিচের ছয় ভাবের কোনো এক ভাবে বিতরণ হতে পারে। (১নং সারণি দেখ)

আপা	দুলাভাই	আমি
কলম	ঘড়ি	মোবাইল
কলম	মোবাইল	ঘড়ি
ঘড়ি	কলম	মোবাইল
ঘড়ি	মোবাইল	কলম
মোবাইল	কলম	ঘড়ি
মোবাইল	ঘড়ি	কলম

সারণি-১

১নং সারণির ছয় রকমের চেয়ে আর কোনোভাবে আমরা তিন জন ঐ তিনটে জিনিস তুলতে পারতাম না। এখন আপা, দুলাভাই ও আমি বুমবুমের কথামতো বাদাম নিলে মোট কতটি নিতাম দেখা যাক, ছয় ক্ষেত্রে (২নং সারণি দেখ)।

আপা	দুলাভাই	আমি	তুলে নেওয়া বাদামের সংখ্যা বুমবুমের দেওয়াটাসহ			মোট	প্লেটে বাকি
কলম	ঘড়ি	মোবাইল	১+১=২	২+৪=৬	৩+১২=১৫	২৩	১
কলম	মোবাইল	ঘড়ি	১+১ =২	২+৮ =১০	৩ + ৬ =৯	২১	৩
ঘড়ি	কলম	মোবাইল	১+২ =৩	২+২ =৪	৩+১২ =১৫	২২	২
ঘড়ি	মোবাইল	কলম	১+২ =৩	২+ ৮=১০	৩ +৩ =৬	১৯	৫
মোবাইল	কলম	ঘড়ি	১+৪ =৫	২+২ =৪	৩+৬ =৯	১৮	৬
মোবাইল	ঘড়ি	কলম	১+৪ =৫	২+৪=৬	৩+৩=৬	১৭	৭

সারণি-২

২নং সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, বুমবুমের কথামতো বাদাম নেওয়ার পর প্লেটে বাদামের সংখ্যা ছয় রকম হয়, ১নং সারণির ছয় রকম বিতরণের জন্য। বুমবুম এই সংখ্যার হিসাবটা জানে, অর্থাৎ প্লেটে অবশিষ্ট বাদাম সংখ্যা দেখে বুমবুম বলে দিয়েছে কার কাছে কোন জিনিসটা ছিল! বন্ধুরা তোমরা চেষ্টা করে দেখ। বুমবুমের শেখানো নিয়মে নিজেরা ম্যাজিশিয়ান হতে পার কি না।

শিকল পরা ছল মোদের ...

প্রথমে ১টা ছোট শিকলের তিনটে রিং-ই খুলে নিতে হবে। তারপর সেগুলোর ১টা দিয়ে পরপর দু'টো শিকল জোড়া দেওয়া যাবে। এবং তিনটে দিয়ে বাকি চারটে ছোট শিকল জোড়া দেওয়া হলেই ১৫টা রিঙের বড় শিকলটা পাওয়া যাবে।

উপসর্গে জুড়লে তীর দেখা পাবে মহর্ষির

তীরের একটা প্রতিশব্দ **শর**। আর উপসর্গের তালিকাতে খুঁজলে পাবে **পরা**। এখন উপসর্গে তীর জুড়তে বলার অর্থ হল পরা+শর = পরাশর। পরাশর নামে একজন বিখ্যাত ঋষির কথা আছে ভারতীয় পুরাণে। কাজেই উপসর্গে তীর জুড়ে **পরাশর** মুনিকে খুঁজে পাওয়া যায়।

আমার মানুষেরা গান করে

এইক্ষেত্রে যাত্রার স্থান থেকে ময়মনসিংহের দূরত্বটা জানা থাকলে হিসাবটা সোজা হত। কিন্তু সেটি জানা না থাকায় একটু ভিন্নভাবে হিসাবটা করতে হবে। ৩০ কিলোতে

যদি ১টা পর্যন্ত দুলাভাই গাড়ি চালান, তা হলে আমরা ময়মনসিংহ ছাড়িয়ে আরো ৬০ কিলোমিটার যাব। আর ২০ কিলোমিটার গতিতে দুপুর ১টায় ময়মনসিংহ আমরা পৌঁছাচ্ছি। অর্থাৎ ৩০ কিলোমিটার আর ২০ কিলোমিটার গতিতে দুপুর ১টা পর্যন্ত চললে ব্যবধান হচ্ছে ৬০ কিলোমিটার। ৩০ আর ২০ কিলোমিটার গতিতে প্রতি ঘণ্টার ব্যবধান হল (৩০−২০=) ১০ কিলোমিটার। তা হলে, ৬০ কিলোমিটার মোট ব্যবধান হতে সময় লাগবে (৬০ ÷১০=) ৬ ঘণ্টা। এর মানে হল ২০ কিলোমিটার গতিতে মোট ছয় ঘণ্টা চালালে আমরা ময়মনসিংহ পৌঁছব। অর্থাৎ আমাদের যাত্রাস্থান থেকে ময়মনসিংহের দূরত্ব (৬ × ২০) =১২০ কিলোমিটার। এখন দুপুর ১টার পরিবর্তে দুপুর ১২টায় পৌঁছতে হলে এই দূরত্ব আমাদের পাড়ি দিতে হবে ৫ ঘণ্টায় (১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা)। তা হলে, গাড়ির গতি হতে হবে (১২০ ÷৫) = ২৪ কিলোমিটার।

এই হিসাবটা বুমবুম ঠিক ঠিক করতে পেরেছে বলে ওর জবাবটা ঠিক হয়েছে। আর শর্টকার্ট করতে গিয়ে আমারটা হয় নি।

তোমার আমার মতন ছিল মায়ের সাতটি ছেলে

বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান ও বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবর রয়েছে যথাক্রমে ভারতে ও পাকিস্তানে। আর বুমবুমের বীরপ্রতীক দাদুর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের ওই ছোট্ট দলে ছিলেন সাত জন মুক্তিযোদ্ধা। বৃদ্ধ মহিলার বাড়িতে ডিমের সংখ্যাও তাই।

মুক্তির মন্দির সোপান তলে

১৫টি ফুল নিয়ে বুমবুম প্রথম লেকের পানিতে যায়। এর পর প্রত্যেক স্মৃতিসৌধে ১৬টা করে ফুল দিয়েছিল। প্রথমবার পানির ছোঁয়া পেয়ে ১৫টি ফুল হল ৩০টা। প্রথম স্মৃতিসৌধে ১৬টা দেওয়ার পর থাকল ১৪টা। এরপর ১৪টা হল ২৮টা, যার ১৬টা পেয়েছে দ্বিতীয় স্মৃতিসৌধ। বাকি ১২টা আবার হল ২৪টা। এর থেকে ১৬টা তৃতীয় স্মৃতিসৌধে দেওয়ার পর ৮টা ছিল। লেকের পানির ছোঁয়াতে ঐ ৮টা হল ১৬টা যার সবগুলো বুমবুম চতুর্থ স্মৃতিসৌধে রেখে এসেছে।

বন্ধুরা, গাড়িতে ফিরতে ফিরতে আমি ভাবছিলাম স্মৃতিসৌধ যদি ৪টা না হয়ে ৩টা হত। তা হলে প্রথমে কয়টা ফুল নিত বুমবুম?

একটি রেমাশ নিবেদন

বাংলাপিডিএফ

বইঘর

বইলাভার্স

কাজিরহাট

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

https://www.facebook.com/limon1999